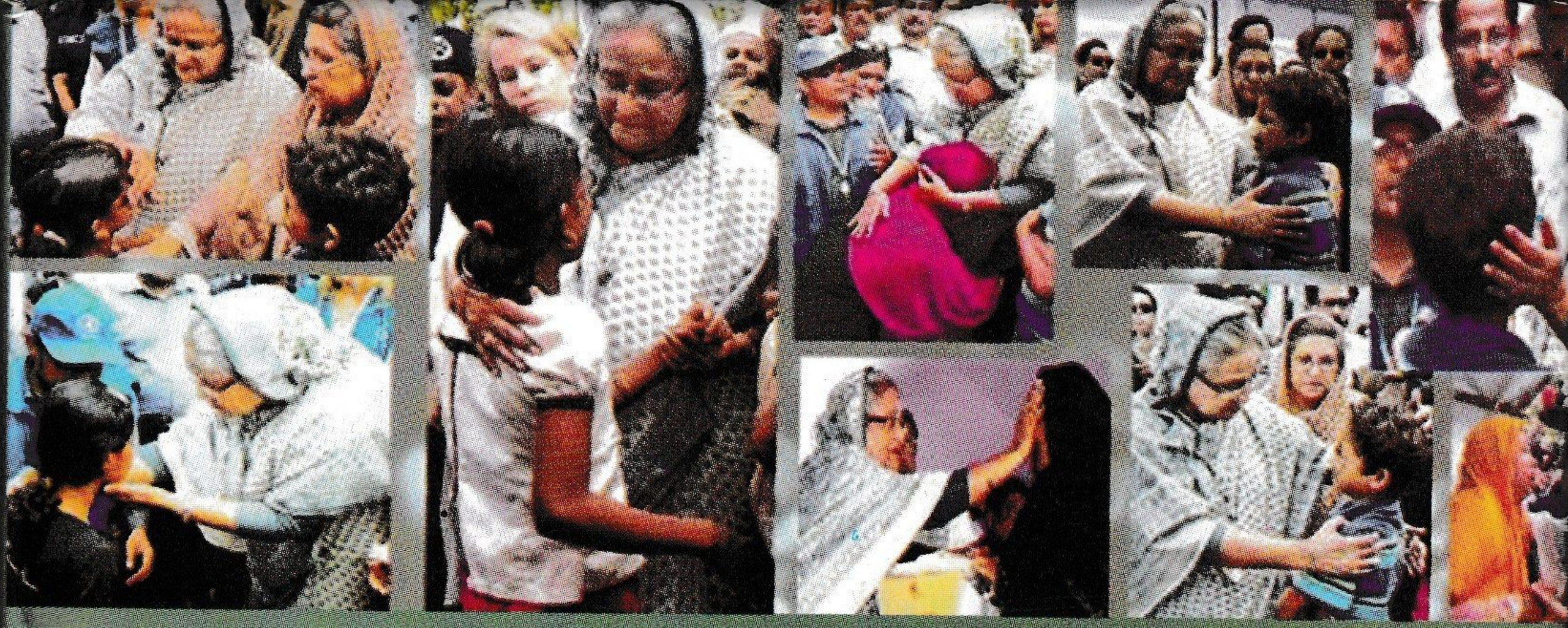

Mother of Humanity

মানবতার জননী

শেখ হাসিনা

জাহিদুল কবির চৌধুরী

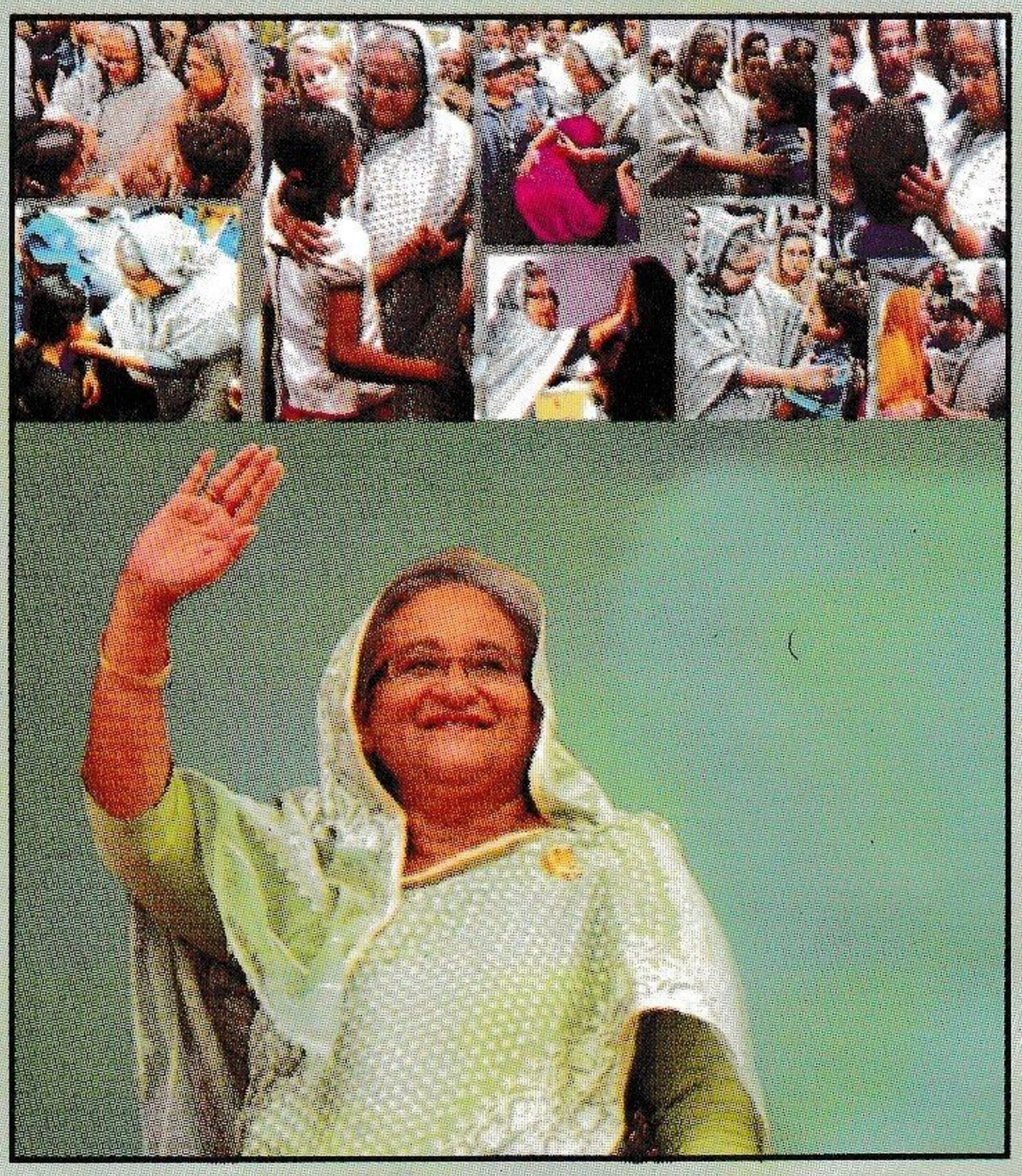

প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত ও নিঃস্ব অবস্থায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মানবতার জননী' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, একটি জাতির অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হওয়া। তিনি মিয়ানমার সরকারের পরামর্শদাতা নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী অং সান সুচিকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করার জন্য চাপের ভেতর রেখেছেন।

শেখ হাসিনা তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করে যাচ্ছেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় বিক্ষুব্ধ পার্বত্যবাসীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন হয়। রাজনৈতিক সমস্যাকে তিনি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

একটি কথা বিশ্বাস এবং আস্থার সঙ্গে বলা যায় যে, বিভিন্ন জনহিতকর কর্মকাণ্ড সম্পাদন এবং মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে শেখ হাসিনা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

Mother of Humanity

মানবতার জননী

শেখ হাসিনা

Mother of Humanity

মানবতার জননী

শেখ হাসিনা

জাহিদুল কবির চৌধুরী

NP

ন্যাশনাল পাবলিকেশন

প্রকাশক
এইচ এম ইব্রাহিম খলিল
ন্যাশনাল পাবলিকেশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১১-৫৮৪২৬২
স্বত্ব
লেখক
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৮
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান
কম্পোজ
শাওন কম্পিউটার
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০
মুদ্রণ
পাণিনি অফসেট প্রেস
একমাত্র পরিবেশক
প্রিয় বুক সেন্টার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯২২৮৪৬৭৬২
অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭, ০১৫১৯৫২১৯৭১

দাম : ২০০.০০ টাকা

ঘরে বসে ন্যাশনাল পাবলিকেশন-এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন : http://rokomari.com/np

Manoboter Jononi Sheikh Hasina by Zahidul Kabir Chowdhury Published By H. M. Ibrahim Khalil, National Publication, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100.
First Published : August 2018. Price : 200.00 Tk. Only.

ISBN : 978-984-90080 -84-0
E-mail : nationalpablication@gmail.com

(এ গ্রন্থের সকল দায়ভার লেখকের)

উৎসর্গ

বাঙালি জাতির হাজার বছরের
শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাংলাদেশের স্থপতি
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই আজ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের মহান স্থপতির বংশে জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্ম না হলে বাংলাদেশ আজকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতো না। বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেত না। দেশ ও গণমানুষের নেত্রী, বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার মানবতার জননী। বিশ্বে আলোচিত ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু গণতন্ত্রের মানসকন্যাই নয়, মানবতার জননী হিসেবে সারা বিশ্বে প্রশংসিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বরাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আজ বিশ্বনেত্রী। বঙ্গবন্ধুর মতো তার চরিত্রে মানুষের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, সততা, দক্ষতা, ধৈর্য ও ক্ষমতাশীলতার বিশেষ গুণ বিদ্যমান। বঙ্গবন্ধুর বড় মেয়ে ব্যক্তিজীবনে প্রয়াত পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাদের দুই সন্তান–তথ্য প্রযুক্তিবিদ সজীব ওয়াজেদ জয় এবং আন্তর্জাতিক আজেস বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সরল-সহজ সাদা মনের অধিকারী শেখ হাসিনার গোটা জীবন নানা আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হয়েছে।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী শেখ হাসিনা ছাত্রজীবন থেকেই বাঙালির অধিকার আদায়ের দাবিতে রাজপথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দূরদর্শিতার চিহ্ন যিনি ইতিমধ্যে রেখে চলেছেন সারা বিশ্বে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শান্তির দর্শন, চেতনা আর মানবতাবাদী পদক্ষেপ সারা বিশ্বে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সমস্যা সমাধানের আলোকবর্তিকা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছেন। শান্তিতে নোবেল জয়ীদের ভূমিকা যখন প্রশ্নবিদ্ধ তখন বিশ্বের মানচিত্রে শান্তির পতাকা হাতে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে প্রশংসিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়া এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘে পাঁচ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের মধ্যমণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। তার উদারতা ও মানবিকতা বিশ্বনেতারা প্রশংসা করেছেন। বিশ্বের শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলোও জননেত্রী শেখ হাসিনার উদারতাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে ছুটে গিয়েছিলেন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে। নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের পরম মমতায় বুকে টেনে নিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গারাও তাদের ভালোবাসার নিদর্শন দিচ্ছেন ভিন্নভাবে। নবজাতক শিশুর নাম রাখছেন হাসিনা। তিনি শান্তির প্রতীক। শান্তিতে নোবেল জয়ীরা যখন অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনা শান্তির পতাকা উড়িয়ে চলছেন বিশ্ব দরবারে। দেশ ও বিদেশে মানুষের হৃদয়ের যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, তা নোবেলের চেয়ে শত-কোটি গুণ বেশি মূল্যবান। কারণ মানুষের ভালোবাসার চেয়ে অন্য কিছু দামি হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ই দেননি, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রথম মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির চুক্তির মাধ্যমে অশান্ত পাহাড়ে শান্তির বার্তা দিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালোরাতে পরিবারের সবাই ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। এ হত্যাকাণ্ডের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি কালো-অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে অবস্থার পরিবর্তন হয় ১৯৮১ সালের ১৭ মে। সে দিন বাংলাদেশের

মাটিতে পা রাখেন সর্বহারা শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশে ফিরে আসেন তিনি। সে সময়ে দেশের বাইরে ছিলেন বলেই ঘাতকের বুলেট তখন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ দেশের সব মানুষেরই ভরসা ছিল, একদিন ফিরবেন তিনি। পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে এগিয়ে নেবেন দলকে ও দেশকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ছিলেন শেখ হাসিনা। তার নামের আগে ও পরে কোনো বিশেষণ যোগ করার প্রয়োজন নেই। এক কঠিন সংগ্রামের পথ বেয়ে নিজ প্রতিভায় বিকশিত তিনি। ৩৭ বছর ধরে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকা, তিনবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তিনি বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

শেখ হাসিনা নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এবং এই আন্দোলনের মুখে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হয়। পিতার মতো দুর্জয় সাহস নিয়ে দেশের রাজনীতি ও জনগণের পক্ষে নিজের দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন, যুদ্ধ করছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখনো এগিয়ে চলেছেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মতো দুই-দুইবার তাকে হত্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন বার্তা পেয়েছে। পথ হারানো জাতি দিশা খুঁজে পেয়েছেন। সেই একই কারণে ৩৭ বছর ধরে তাকে হত্যার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মহান আল্লাহর কৃপায় তিনি বারবার বেঁচে গেছেন। পিতার সাহস ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাকে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বদরবারে আসন দিয়েছে। তার সবচেয়ে বড় সাফল্য, যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে না যাওয়া। তার চারিদিকে এখনো বহু শত্রু। যুদ্ধের ময়দানে একাই লড়ছেন। সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন, স্বৈরাচারের কাছে আত্মসমর্পণ এবং দেশ ও জনগণের বিপদের মুহূর্তে দেশত্যাগ বা রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কোন ঘটনাই নেই তার জীবনে। তাই তিনি বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের একজন সফল রাজনৈতিক নেত্রী ও রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন।

শেখ হাসিনা যদি আওয়ামী লীগের ও দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ঘোর দুর্দিনে সম্পূর্ণ অভাবিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে সব দ্বিধা, সংকোচ ও সংসারের বন্ধন ত্যাগ করে রাজনীতির পথে এসে না দাঁড়াতেন এবং বঙ্গবন্ধুর

রাজনীতির পতাকা আবার সাহসের সঙ্গে ঊর্ধ্বে তুলে না ধরতেন, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা আজ কি হতো, তা ভাবতেও ভয় লাগে। তিনিই আজকের জননেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী এবং এক সঙ্গে বিশ্বনেত্রী। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে নিজেকে সমাসীন করার জন্য প্রস্তুতি পর্ব সমাপন করে সম্মুখে শান্তি পারাবার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দৃঢ় ও দীপ্ত পদক্ষেপে। বিশ্বজুড়ে জঙ্গিবাদ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি, সংঘর্ষ; আক্রান্ত বারুদের ঝংকারের বিপরীতে শান্তির বার্তা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বজুড়ে যে জঙ্গিবাদের বিস্তার, তার নির্মূলে তিনি সোচ্চার। নিজ দেশের সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের তিনি দমন করেছেন সাহসের সঙ্গে। নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনেক উচ্চতায় তিনি নিয়ে গেছেন যে কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেল। জননেত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে সহজ-সরল মহত্ব রয়েছে, যা সবার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করে। নানা ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে জাগ্রত তিনি। সমগ্র জাতিকে নির্জীবতা থেকে মুক্ত করার জন্য দীর্ঘ লড়াই অব্যাহত রেখেছেন। সংগঠক হিসেবে নিজ দলকে এবং দেশকে করে তুলেছেন গতিশীল। তিনি বাঙালির প্রতীক এবং পুরো দেশের প্রতিনিধি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশকে। দেশের উন্নয়ন আর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন জননেত্রী শেখ

হাসিনাকে। তিনি ভালো থাকলে বাংলাদেশের মানুষ ভালো থাকবে। দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরতে থাকবে। দেশবাসী দোয়া করবেন তিনি যেন সব বিপদ-আপদ ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়তে পারেন এবং হেফাজতে রাখতে পারেন। কারণ আজকের বাস্তবতায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। তিনি হচ্ছেন গণতন্ত্র-স্বাধীনতার লাল সবুজের পতাকা, সার্বভৌমত্ব ও বাঙালি জাতির রক্ষক। বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। তিনি আছেন বলেই দেশে গণতন্ত্র আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীর বিচার হচ্ছে। রায়ও কার্যকর হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। স্বাধীনতার শত্রুমুক্ত দেশের জন্য আজও তার নির্দেশ পুরো জাতিকে সাহসে উজ্জীবিত করে রেখেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির নায়ক শেখ হাসিনা বিশ্বনায়ক অভিধার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে আরও মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবেন এই প্রত্যাশায় মাদার অব হিউম্যানিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবেন এই সোনার বাংলাদেশে।

রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান আজ বিশ্বসমাজের অভিন্ন দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে কোনো কোনো দেশ প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও তারাও চায় এ সমস্যার সমাধান হোক। সমস্যার সমাধানে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়টি প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার দশক ধরে রাখাইন রাজ্যের এ ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠিটি সীমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার। রোহিঙ্গা জন-গোষ্ঠিটির ৮০ শতাংশের বেশি স্বদেশ ছেড়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আগে থেকে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠির পাঁচ লক্ষ সদস্য বাংলাদেশে রয়েছে। এর পরেও বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে আরও মাসে অন্তত ৫ লক্ষ। সৌদি আরব পাকিস্তান, ভারত, মালোয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছে আরও ৮ লক্ষ রোহিঙ্গা। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে শত শত বছর ধরে রাখাইনে বসবাসকারী এ ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠির সদস্যদের নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। এ ব্যাপারে মিয়ানমারের সুমতি ছাড়া শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কারণ কথায় কথায় রাখাইনে জাতিগত নিধনের যে ভয়াবহ

তাণ্ডব চলছে, সে অবস্থায় কোনো রোহিঙ্গা স্বদেশ ফিরে যাওয়া ও আত্মহত্যার মধ্যে গুণগত খুব একটা পার্থক্য থাকবে না।

মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, অবাধ চলাচলের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত কবরার বিষয়ে এখন আগের চেয়ে নমনীয়। তারা কফি আনান কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে দৃশ্যত ইতিবাচক মনোভাবই দেখিয়েছে। তাদের আপত্তি রোহিঙ্গাদের একাংশের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড নিয়ে। রোহিঙ্গাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ায় পাশাপাশি কিভাবে রাখাইনে জঙ্গিবাদের বিপদ এড়ানো যাবে, সে বিষয়টিও সব পক্ষকে ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের যৌথ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

মিয়ানমারের ওপরে জঙ্গিবাদের থাপা শুধু প্রতিবেশী দেশ নয়, বাংলাদেশের জন্যও বিপদ সৃষ্টি করছে। রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় আলোচনাও প্রাসঙ্গিকতার দাবিদার। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অভিন্ন বক্তব্য–চীন, রাশিয়া ও ভারতের সহযোগিতা থাকতে হবে। সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ দফা প্রস্তাব বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী মিয়ানমার। কিছুকাল আগেও এর নাম ছিল বার্মা। আমরা একে জানতাম 'ব্রহ্মদেশ' নামে। প্রায় ৯০ শতাংশ বর্মন জাতিসত্ত্বার মানুষের বাসভূমি বলে এর নাম ছিল ব্রহ্মদেশ বা বার্মা। ঔপনিবেশিক আমলের পর থেকেই দেশটি সেনাশাসিত বা সেনানিয়ন্ত্রিত দেশটির অধিপতি শ্রেণির মধ্যে সেনাপতি ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদেরই প্রাধান্য। বেসামরিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিয়ানমারে গড়ে ওঠেনি। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কী জিনিস, তা তারা জানে না। সেই অবস্থায় ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত অং সান সু চি যখন গণতন্ত্রের কথা বললেন, পশ্চিমারা তাকে উৎসাহিত করল। প্রতিবেশী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভেবেছিলেন সু চির নেতৃত্বে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হবে এবং সামরিক স্বৈর শাসনের অবসান ঘটবে। কিন্তু সে গুড়ে যে বালি তা শিগগিরই বুঝতে পারলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। গণতন্ত্রের যে পোশাক সু চি পরে থাকেন ওটা তার অভিনয়।

গত কয়েক দশকে মিয়ানমারে সহিংস বৌদ্ধ মৌলবাদের উত্থান ঘটেছে। উগ্র মৌলবাদী প্রায় পাঁচ লক্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর সেই আন্দোলনের ২০০৭ সাল থেকে নামকরণ হয় "স্যাফ্রোন রেভ্যুলেশন"। ধর্মনেতারা আন্দোলনটা কোনো ধর্মীয় বিষয় নিয়ে শুরু করেননি, কিন্তু অবিলম্বেই দেখা গেল উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য।

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হাজার বছরেরও বেশি সময় যাবৎ। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী আরাকান রাজসভায় বাংলাসাহিত্যের চর্চা হয়েছে মধ্যযুগে। মধ্যযুগের মুসলমান কবি আলাওল, দৌলত কাজী–আরাকান রাজসভারই কবি। উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উত্থানের পর থেকে সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্ম, বর্ণ, ভাষা-ভাষীর নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার হরণ করা হয়।

যখন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন মিয়ানমারে আসে, তাদের অপদস্থ করা হয়। যখন কফি আনান কমিশন তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে; সেই দিনই রোহিঙ্গাদের জীবনে আসে নির্যাতন। কফি আনানের সুপারিশের প্রতিবেদনে ৮৮টির মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং তাদের চলাচলের ওপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার।

পরবর্তীতে সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ মৌলবাদীদের বর্বরোচিত উৎপীড়ন থেকে জীবন বাঁচাতে রোহিঙ্গা মুসলমানরা দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় অব্যাহিতভাবে অত্যাচার ও গণহত্যা চালাচ্ছে। পৃথিবীতে মানবাধিকার বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে তার লেশমাত্র নেই রোহিঙ্গাদের জীবনে। রোহিঙ্গাদের অবস্থা খাঁচায় অবস্থানরত বন্দি পাখির মতো। শুধু সেনাবাহিনী নয়, তারা উগ্র বৌদ্ধ মৌলবাদীদেরও নির্যাতনের শিকার। পশ্চিমা গণমাধ্যমের খবরেই জানা গেছে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে কোনো প্রকার খাবার পর্যন্ত নিতে দিচ্ছে না তারা।

সেখানে সারা বছরই কমবেশি নির্যাতন-নিপীড়ন চলে, ২০১২ থেকে রাখাইন বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে বীভৎস সংঘাত হয়। ২০১৩-তে মুসলিম-বিরোধী সংঘর্ষ রাখাইন রাজ্যের বাইরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৪- তে মুসলিম-বিরোধী একতরফা দাঙ্গায় মান্দালয়ে বহু হতাহত হয়। বর্তমানে আগের চেয়ে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হত্যা, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, নারী নির্যাতন প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে রাখাইন প্রদেশে। রোহিঙ্গাদের অপরাধ হচ্ছে তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষায় কথা বলে এবং ধর্মে মুসলমান।

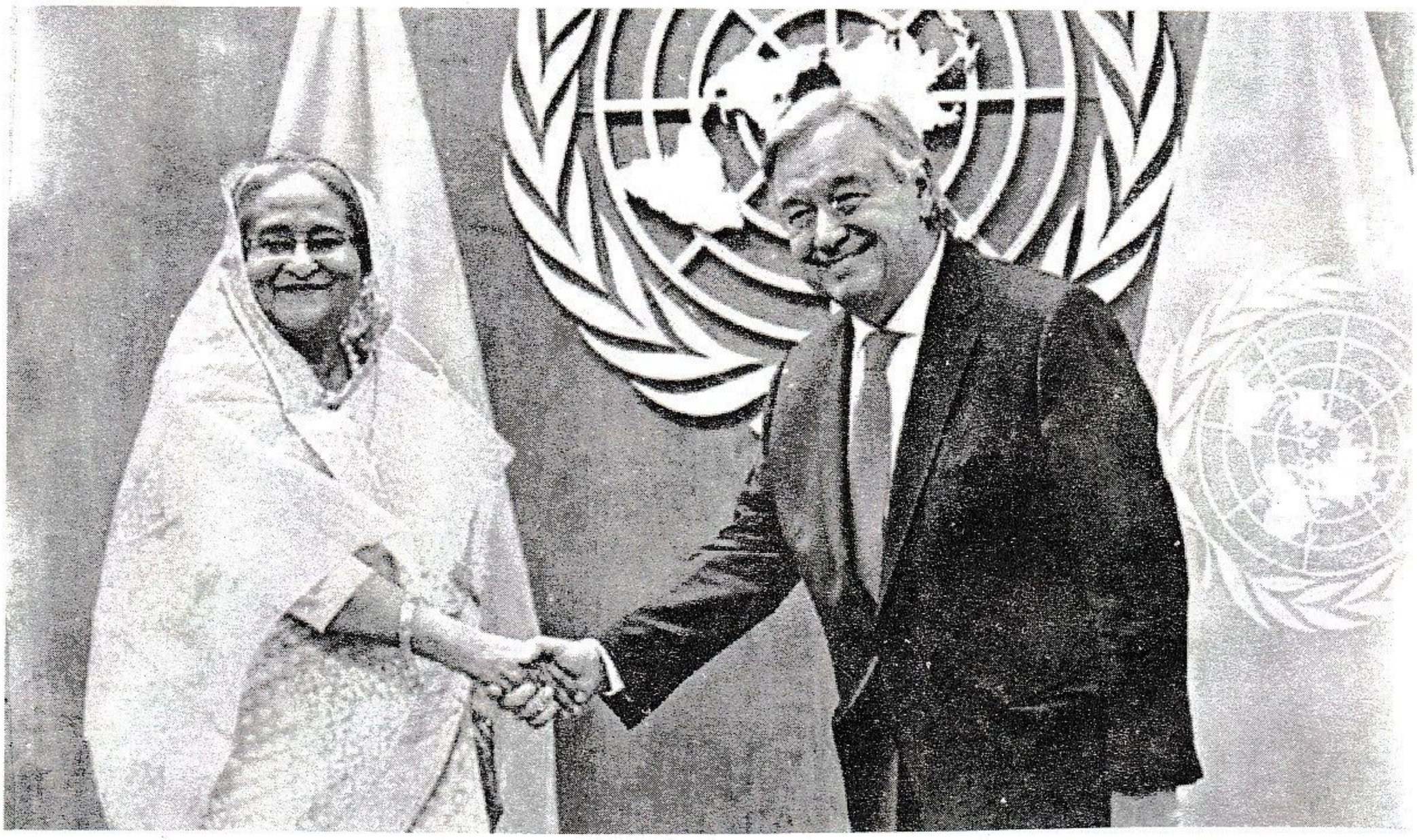

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও তাদের নাগরিক অধিকার হরণ মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু তা বাংলাদেশকে বিপন্ন করছে। জনবহুল বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রায় বার লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাপ সহ্য

করছে। বাংলাদেশে বহু উগ্র ইসলামী গোষ্ঠি সক্রিয়। অভাবের তাড়নায় রোহিঙ্গাদের অনেকে এই সব গোষ্ঠিতে যদি যোগ দেয়, তা হবে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তার পরেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই সব রোহিঙ্গাদের বুকে টেনে নিয়ে মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধি পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে ইসলামী সহযোগী সংস্থা ওআইসির গ্রুপের সভায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মুসলিম দেশগুলোর এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা বিষয়ক কফিআনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নেরও দাবি জানিয়েছেন। ওআইসির মহাসচিব ইউসুফ আল ওখাইমেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে বলেন, সংকটের মূলে রয়েছে মিয়ানমার। সমস্যার সমাধানও মিয়ানমারকে করতে হবে। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছে, যাদের ৬০ শতাংশই শিশু। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী সহযোগী সংস্থাভুক্ত দেশের নেতাদের বাংলাদেশে এসে রোহিঙ্গাদের দুর্দশা দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী ছয় দফা প্রস্তাবও দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলো হলো–রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব ধরনের নির্মমতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে অবশ্যই তাদের স্বদেশে ফেরত নিতে হবে; নারী শিশু ও বৃদ্ধদের সুরক্ষা দিতে মিয়ানমারের ভেতর নিরাপদ অঞ্চল তৈরি এবং অনতিবিলম্বে নিঃশর্তভাবে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে; মিয়ানমার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে এবং অবশ্যই রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে ওআইসি যে সব উদ্যোগ নেবে বাংলাদেশ তার সঙ্গে থাকবে বলে আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ওআইসির গ্রুপের সভায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা তাৎপর্যের দাবিদার। মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাধ্য করতে এবং প্রভাবশালী

দেশগুলোর সুমতি ফিরিয়ে আনতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। রোহিঙ্গা সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যহীনতার কারণে। নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই সে ভুল পথ থেকে সরে আসতে হবে।

একজন মা তার মৃত সন্তানের মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে–এরকম দৃশ্য সহ্য করা কঠিন–কথাটি বলেছেন মানবতার জননী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ-গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে, নারী-পুরুষ-শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই ভয়ংকর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য একজন-দুজন নয় আট লক্ষের চেয়ে বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন শেখ হাসিনা। এত অল্প সময়ে এত বেশি শরণার্থী নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাজির হয়েছে।

রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে থাকত। এ মুহূর্তে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গার সংখ্যা কমে হাতেগোনা অবস্থায় চলে এসেছে। তাদের বেশিরভাগই সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বহুদিন থেকে মিয়ানমার এটিই করতে চেয়েছিল। তারা শেষপর্যন্ত এটি করতে পেরেছে। পৃথিবীর মানুষের সমালোচনা কিংবা ধিক্কার এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে পারলে মিয়ানমার তাদের বহুদিনের আশার চূড়ান্ত সমাধানটি শেষপর্যন্ত করে ফেলতে পেরেছে। যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের পাশের দেশ ভারতের এই রোহিঙ্গা বিপর্যয় নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। চীন এবং রাশিয়া বলে দিয়েছে, তারা মিয়ানমারের পক্ষে। নিউইয়র্ক থেকে শেখ হাসিনা সেটা সোজা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পাবে। মিয়ানমারের জেনারেল সাহেব ইউরোপে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সারা পৃথিবীতে খুবই দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অং সান সু চিকে সাধারণ মানুষজন একটু গালমন্দ করছে–চোখ-মুখ বন্ধ করে এ সময়টা পার করে দিলেই পৃথিবীর মানুষ এর কথা ভুলে যাবে।

শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া অং সান সু চি টেলিভিশনের একটি বক্তৃতায় বলেছেন, একাত্তরে বাংলাদেশের এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয়

নিয়েছিল। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ যখন সেটা নিয়ে পাকিস্তানের ওপর চাপ দিয়েছিল তখন কোনো এক পর্যায়ে পাকিস্তানি মিলিটারি শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিল। সেই আহ্বান শুনে একজন শরণার্থীও ফিরে যায়নি। পাকিস্তান মিলিটারিরা জানত সেটা ফাঁকা বুলি। শরণার্থীরাও জানত সেটা ধাপ্পাবাজি। নিজের জীবন নিয়ে কে ধাপ্পাবাজের দিকে পা দেবে। মিলিটারির গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার থেকে অনাহারে, রোগে-শোকে মারা যাওয়াটাই তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। শরণার্থী ক্যাম্পে তখন প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। এবার শান্তিতে নোবেল পাওয়া অং সান সু চি পাকিস্তান মিলিটারি পরিকল্পনা থেকে একটুও সরেননি। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যাচাই-বাছাই করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত নেওয়া হবে। যাচাই-বাছাই করার প্রক্রিয়াটি কি? যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে তাদের কাছে কি কাগজপত্র প্রমাণ হিসেবে আছে? সব চেয়ে বড় কথা, এই জনগোষ্ঠির কোনো নাগরিকত্ব নেই। একজন মানুষ একটি দেশে থাকে কিন্তু সে এই দেশের নাগরিক নয়। দেশের সংবিধানের কথাগুলো লেখা থাকে সেই

দেশের নাগরিকের জন্য। কাজেই যারা সেই দেশের নাগরিক নয় তাদের জন্য রাষ্ট্রের জন্য কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। যার অর্থ রোহিঙ্গা শিশু লেখাপড়া করতে পারবে না। অসুস্থ হলে চিকিৎসা পেতে পারবে না। বাসে-ট্রেনে উঠতে পারবে না। সে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে না। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, দেশের সুনাগরিকরা যদি কিছু রোহিঙ্গাকে কেটে

টুকরো টুকরো করে ফেলে, সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। রোহিঙ্গা মেয়েরা যেহেতু নাগরিক নয়, কাজেই তাদের ধর্ষণ করাও নিশ্চয় অপরাধ নয়।

অং সান সু চি যাচাই-বাছাই করে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়ার কথা বলে অবশ্যই স্বীকার করে ফেলেছেন শরণার্থী বলে কিছু আছে। চীন-রাশিয়া এবং ভারত পাশে থাকলে যে কোনো মিথ্যা কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায়। নাফ নদের এপার থেকে যখন দেখা যায় রাখাইন রাজ্যে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলছে তখন আগুনটাকে অস্বীকার করা একটু কঠিন হয়ে যায়। তখন রাখাইন রাজ্যের কর্মকর্তারা বলছে মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। এর চাইতে নিষ্ঠুর কথা আর কি হতে পারে? শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া অং সান সু চির বক্তব্য হচ্ছে, তাদের দেশের মিলিটারিরা পরবর্তিতে আর কিছু করেনি। মিলিটারি অ্যাকশন বন্ধ করার জন্য তিনি সারা পৃথিবী থেকে এক ধরনের বাহবা কিংবা সম্ভব হলে শান্তির জন্য দ্বিতীয় আরেকটি নোবেল আশা করছেন। তা না হলে এত বড় একটা মিথ্যা কিভাবে বলতে পারেন!

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিয়ানমারে ছুটে গিয়েছিলেন। সামরিক শাসন শেষ হয়ে মিয়ানমার গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে গেছে সেই আনন্দে সারা পৃথিবী নৃত্য করছে। রোহিঙ্গা বিপর্যয়ের কারণে আমরা এখন মিয়ানমারের গণতন্ত্রের প্রকৃত ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। তাদের সংসদের শত ৭৫ ভাগ সিট মিলিটারিদের জন্য। শুধু তাই নয়, কোনো বিল পাশ করতে হলে শতকরা ৭৫ ভাগের ভোট পেতে হয়। যার অর্থ কোনো বিল পাস হবে এবং কোন বিল পাস হবে না সেটি সে দেশে মিলিটারি ঠিক করে দেয়। সেই দেশের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে মিলিটারি কিন্তু দেশটাকে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করার জন্য রয়েছে শান্তিতে নোবেল পাওয়া সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় সিক্ত ফটোজেনিক একজন মহিলা।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ হতভাগ্য রোহিঙ্গাদের বুকে আগলে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাদের দেখতে শরণার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন, তখন একজন বিদেশি সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করল, এই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় কতদিন রাখবেন? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বললেন, কত দিন। ওরা সবাই মানুষ; পৃথিবীর সবাই লাভ-ক্ষতির হিসেবে করছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই লাভ-ক্ষতির হিসেবে করেন না। একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছি।

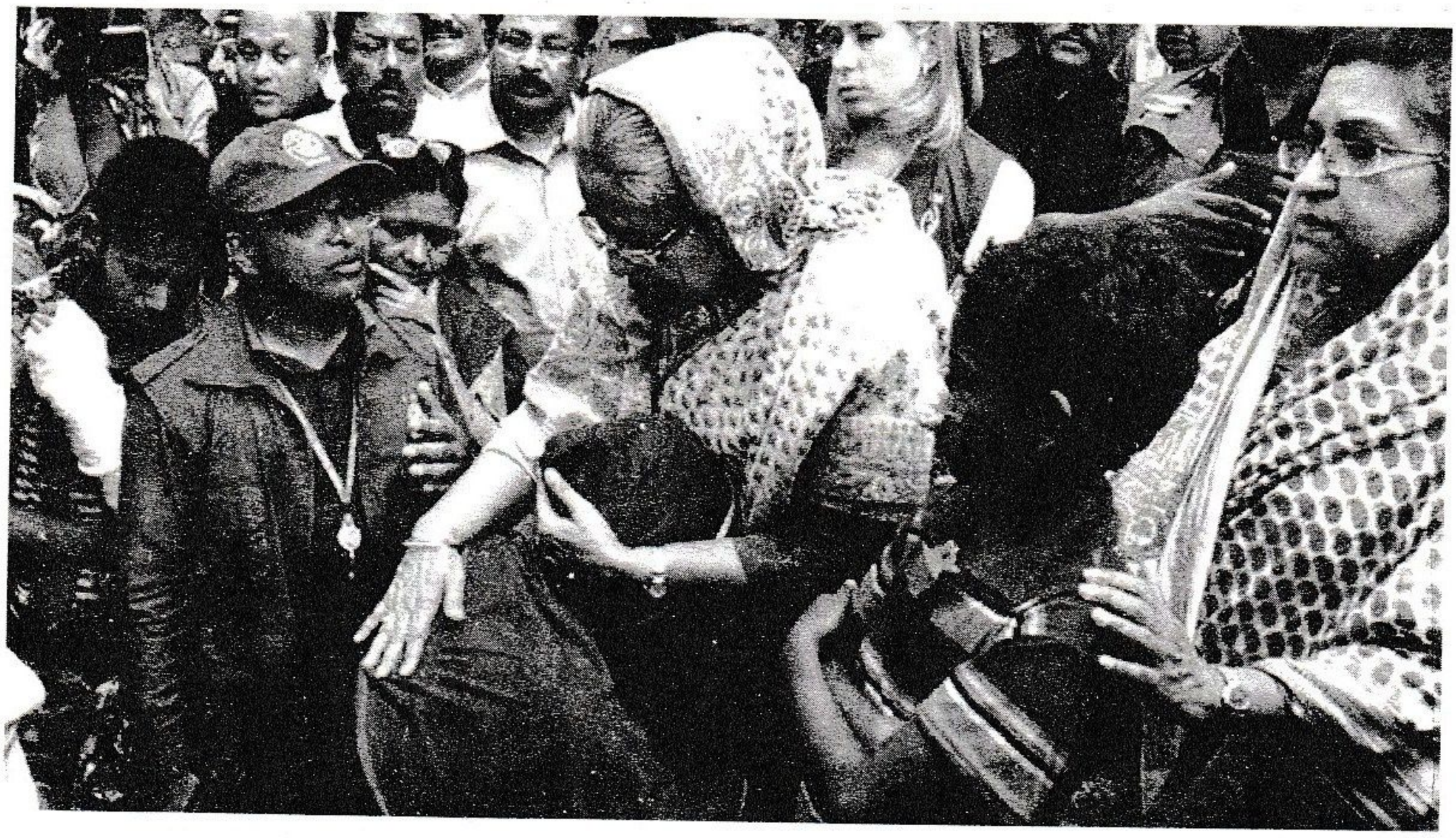

মায়ানমারে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ব একে একে নিন্দা জানিয়েছেন সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রে রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর মিয়ানমারে যে নৃশংসতা ও নিপীড়ন চলছে তাকে গণহত্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এ গণহত্যা বন্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিয়ে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করেছেন। সংকট নিরসনে জাতিসংঘকে জোরালো পদক্ষেপের তাগিদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান, তুরস্ক, বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশ রাখাইন সংকট উত্তরণে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে এ সংকট নিরসনে বেশ কিছু বৈঠক করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্প মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকটের অবসানে জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদকে 'বলিষ্ঠ ও দ্রুত' পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়াবহ নৃশংসতা–গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া ও রোহিঙ্গাদের নিজ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানী রোহিঙ্গা ইস্যুতে এক জরুরি বৈঠকে বলেছেন,

মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং বিপন্ন এই জনগোষ্ঠির জন্য তারা ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেল তায়েব এরদোগান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে রাখাইন পরিস্থিতিকে সিরিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেখানে চলমান জাতিগত নিধন বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিব বরিস জনসন রাখাইনের সংকট উত্তরণে বেশ কিছু বৈঠক করেছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থেনিও গুতেরেশ মিয়ানমারে চলমান সংকটকে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন।

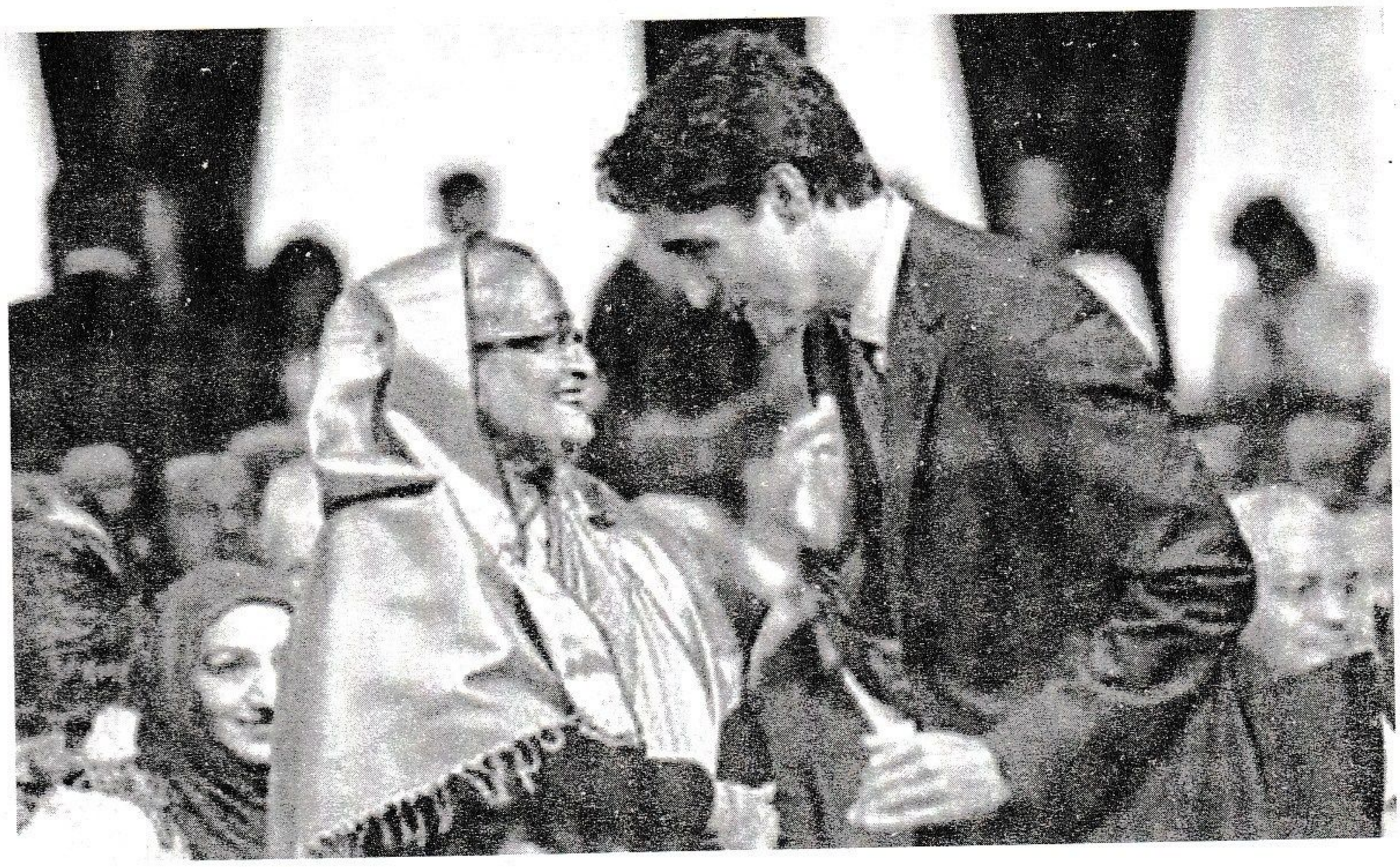

২০০৬ নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ১৯৭৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মেইরিড ম্যাগুয়ার, ১৯৭৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী বেটি উইলিয়াম, ১৯৮৪ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটু, ১৯৮৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অস্কার অ্যারিয়া সানচেজ, ১৯৯৭ সালে শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ইউলিয়ামস্, ২০০৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী শিরিন এবাদী, ২০১১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী লেইসাহ বোয়ি, ২০১১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী তাওক্কাল কারমান, ২০১৪ সালে শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই, ১৯৯৩ সালে পদার্থবিজ্ঞান বা মেডিসিনে নোবেল

বিজয়ী স্যার রিচার্ড জে রবার্টস্ এবং ২০০৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে বা মেডিসিনে নোবেল বিজয়ী এলিজাবেথ ব্লাকবার্ন। বিশ্বের ১২ জন নোবেল জয়ী ব্যক্তি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন সত্যি শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের ওপর যে মানবতা প্রদর্শন করেছেন তা বিশ্ববাসীর বিবেককে নাড়া দিয়েছে।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মিয়ানমার স্বাধীন হওয়ার পর এবং পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের সময়কালে মিয়ানমার তার সীমানাভুক্ত রোহিঙ্গাসহ সব জাতিগোষ্ঠিকে পূর্ণ নাগরিক বলে স্বীকার করে নেয় এবং সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বও দেয়। এটা আশ্চর্যজনক যে, ১৯৮০-র দশকে সে দেশের সামরিক শাসকেরা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে বসে যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমার নাগরিক নয়। এরপর তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং তাদের সে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বিভিন্ন সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে। শুরু হয় জাতিগত ও ধর্মীয় নিধনের উদ্দেশ্যে রোহিঙ্গাদের ওপর সুপরিকল্পিত নির্যাতন। জাতিসংঘের মহাসচিব যথার্থই বলেছেন যে, রোহিঙ্গাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও অমীমাংসিত দুর্দশা আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার একটি অনস্বীকার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। মিয়ানমারের শাসকদের অবশ্যই সহিংসতার এই দুষ্টচক্র বন্ধ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং নিপীড়িত সবার নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার ২০১৬ সালে রাখাইন অ্যাডভাইজরি কমিশন গঠন করেছিল, তার সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে মিয়ানমার সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে আপনারা যেন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন– সে জন্য আমরা আবারও আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। কফি আনানের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিশন যার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন মিয়ানমারের নাগরিক। রোহিঙ্গা নাগরিকত্ব প্রদান, অবাধ চলাচলের সুযোগ, আইনের চোখে সমান অধিকার, রোহিঙ্গাদের স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, যার অভাবে স্থানীয় মুসলিমরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নিজ ভূমিতে ফিরে আসা মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সহায়তা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেছিল। মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর জঙ্গিদের আক্রমণ এই আশংকাকে সত্য প্রমাণিত করল। স্থায়ী শান্তির জন্য

গঠনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে যা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। (১) কমিশনের সদস্যগণ অবিলম্বে সুপারিশ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের জন্য পুনর্বিবেচনা করুন, (২) উদ্বাস্তুদের বহির্প্রকাশ বন্ধ করতে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, (৩) নিয়মিতভিত্তিতে দুর্বল এলাকায় পরিদর্শন করতে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের আমন্ত্রণ জানান এবং (৪) যে সব শরণার্থী ইতিমধ্যে দেশত্যাগ করেছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলমান রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বিএনপি-জামায়াত নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার প্রশ্নে বলেছেন, ওদের সঙ্গে আমাকে কেন বসতে হবে? আমি একটি কারণে বিএনপি-জামায়াতের সাথে বসতে চাই না, বিএনপি-জামায়াত খুনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, বিএনপি লুটরা দল আর জামায়াত যুদ্ধাপরাধী দল। বিএনপির লুট করাই একমাত্র কাজ। এরা মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে না।

শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। আমরা অর্থনৈতিক উন্নতি চাই, মানব ধ্বংস নয়, মানবকল্যাণ চাই। এটাই হোক আমাদের সবার লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ পরিষদে নিউইয়র্ক সময় সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় জাতিসংঘে তার ১৪তম ভাষণ দিলেন মাতৃভাষা বাংলায়। প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা তার ভাষণে বাংলাদেশের সম্ভাবনার কথা যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি গুরুত্বারোপ করেছেন মিয়ানমার রোহিঙ্গা নির্যাতনের অবসান এবং মধ্যপ্রাচ্য সংকট মোচন ও সবার শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৭ মিনিটের বক্তৃতার সময় অধিবেশন কক্ষের দর্শকেরা নয় বার করতালি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে প্রায় ৪ ঘণ্টায় ১৪ জন সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন। তাদের ভাষণের সময় এমনটি ঘটেনি। শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত। কেননা আমার চোখে বারবার ভেসে উঠেছে ক্ষুধার্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যাবার আগে কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, যারা জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে আজ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য মতে, প্রায় ৮ লক্ষ শরণার্থী এসেছে। অথচ জাতিগত নিধনের শিকার এসব রোহিঙ্গা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারে বসবাস করছে।

শেখ হাসিনা বলেছেন, নিজ ভূখণ্ড থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত প্রায় বার লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় ও সুরক্ষা বাংলাদেশ সরকার দিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান নৃশংসতা এবং মানবাধিকার লংঘনের ফলে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থার ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। এতে শেখ হাসিনা ভীষণভাবে দুশ্চিন্তগ্রস্ত। যখন দেখা যায় এই রোহিঙ্গাদের ফেরত যাওয়া ঠেকানোর জন্য সে দেশের কর্তৃপক্ষ মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সীমানা বরাবর স্থলমাইন পুঁতে রেখেছে। এই সব মানুষ নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে শেখ হাসিনা মিয়ানমারে চলমান সব ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের নিন্দাজ্ঞাপন করে বলেছেন, এই রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলবে।

প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতা বন্ধে এবং ওই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করায় নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও জাতিসংঘের মহাসচিবকে ধন্যবাদ জানান। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদকে বৈশ্বিক সমস্যা অভিহিত করে তা মোকাবিলায় তিনটি প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সন্ত্রাসীদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ

করতে হবে। সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ণ বন্ধ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা করতে হবে। বর্তমানে অর্থপাচার সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অন্যান্য আন্তরাষ্ট্রীয় সংঘবদ্ধ অপরাধের ক্ষেত্রে সাইবার জগৎ থেকে উদ্ধত হুমকি মোকাবিলা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ এবং সহিংস জঙ্গিবাদ শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। একজন সন্ত্রাসীর কোনো ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র নেই। আমি নিজে বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছি। সে হিসেবে আমি সন্ত্রাসের শিকার মানুষের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রকাশ করছি। আমি মনে করি তাদের সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমরা ধর্মের নামে যে-কোনো সহিংস জঙ্গিবাদের নিন্দা জানাই। সহিংস জঙ্গিবাদ বিস্তার রোধে তৃণমূল পর্যায়ে আমরা পরিবার, নারী, যুবসমাজ, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ত করেছি।

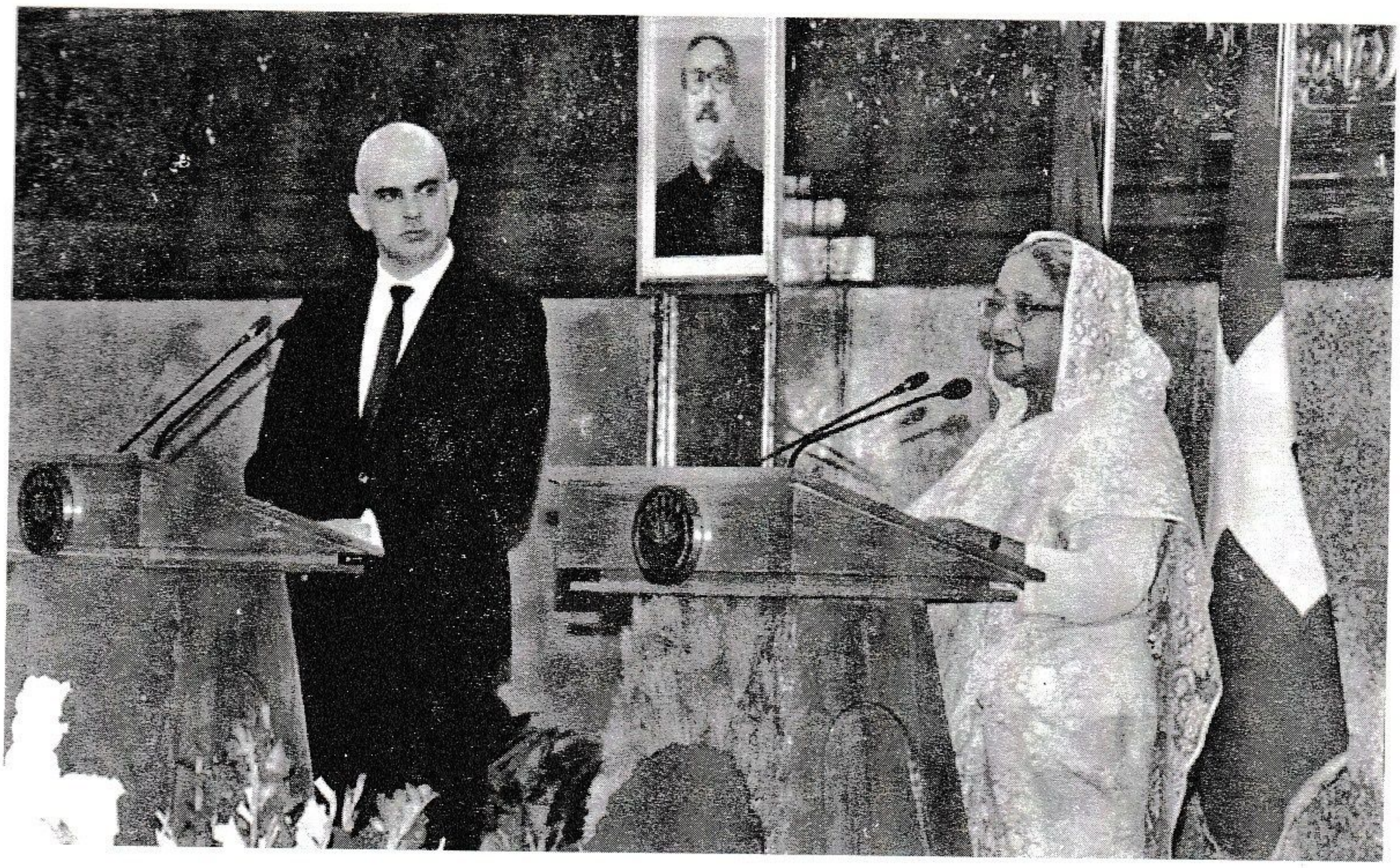

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক প্রথম ভাষণের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের হয়ে প্রথমবারের মতো এখানে ভাষণ দেওয়ার সময় এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষে তার অঙ্গীকারের কথা বলে গেছেন। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বলেছিলেন এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থায় সব মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের অপেক্ষা প্রতিফলিত হবে এবং আমি জানি আমাদের এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লক্ষ লক্ষ শহীদের বিদেহী আত্মার স্মৃতি নিহিত রয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই আমরা শান্তিকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে চলেছি। এ উপলব্ধি থেকেই সাধারণ পরিষদে ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর শান্তির সংস্কৃতি (কালচার অব পিস) শীর্ষক প্রস্তাব পেশ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ভয়াবহতম গণহত্যার শিকার হয়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী ৩০ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসেরভিত্তিতে চিহ্নিত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে তারা দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। শেখ হাসিনা ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, ৭১-এর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সম্প্রতি ২৫ মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। মূলত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতেই অপারেশন সার্চ লাইট-এর মাধ্যমে তারা গণহত্যার সূচনা করেছিল। এই গণহত্যার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের আমরা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি করেছি। বিশ্বের কোথাও যাতে কখনই আর এ ধরনের জঘন্য অপরাধ সংঘটিত না হয় সেই জন্য আমি বিশ্ববাসীকে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি বিশ্বাস করি, ৭১-এর গণহত্যাসহ ঐতিহাসিক ট্রাজেডির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ তহবিলে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রতীকী অনুদান প্রদানের ঘোষণা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকেই আমরা শান্তিকেন্দ্রিক অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চলেছি। এ উপলব্ধি থেকেই সাধারণ পরিষদে ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর শান্তির সংস্কৃতি শীর্ষক প্রস্তাব পেশ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

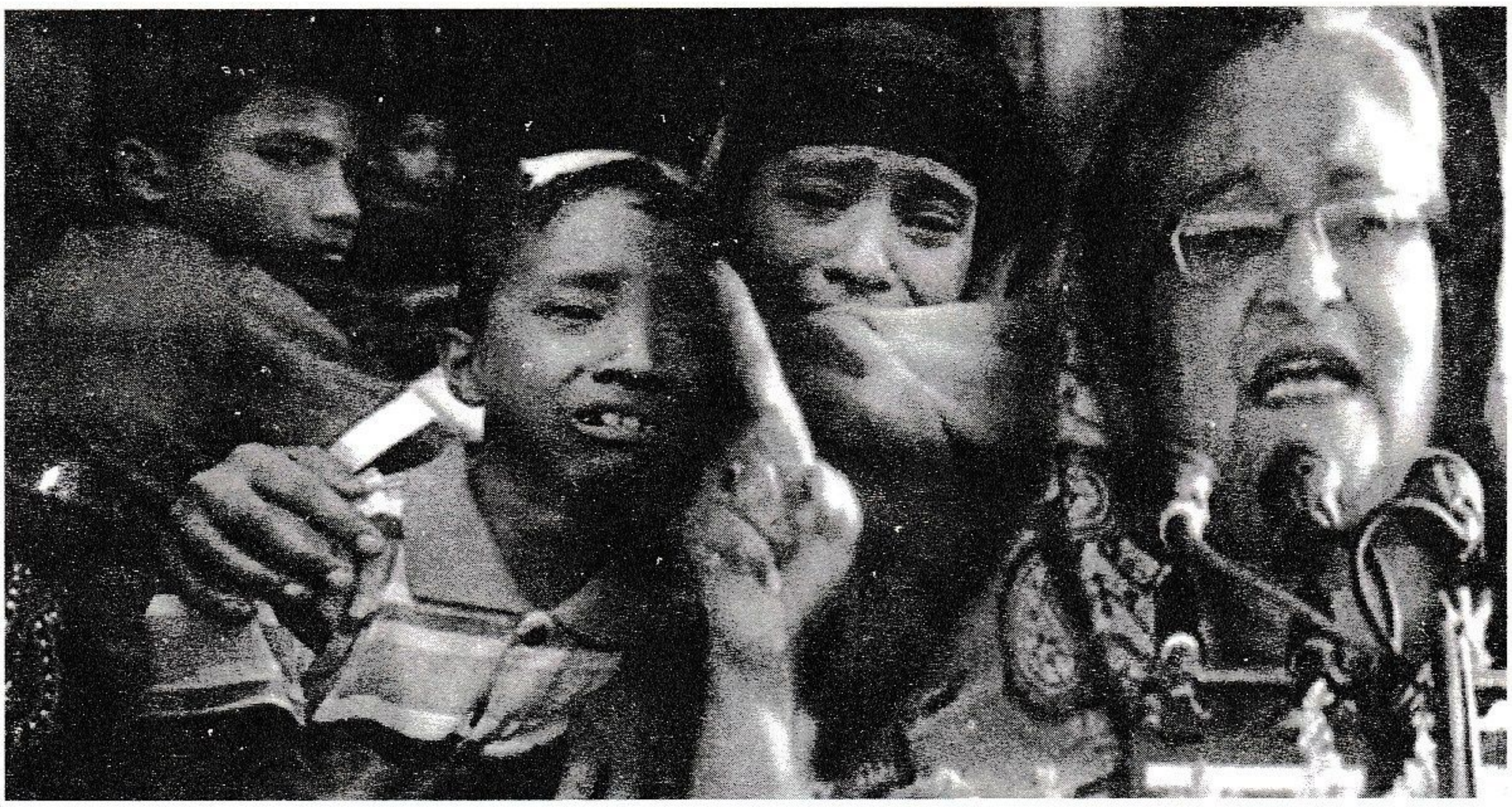

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনা শুরু করা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য এবং শত্রুতা নিরসনের জন্য আমি সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী আশা করেন শান্তি বিনির্মাণে জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। এ লক্ষ্যে অব্যাহত শান্তির জন্য অধ্যায়ন বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছ থেকে আমরা সাহসী এবং উদ্ভাবনমূলক প্রস্তাব প্রত্যাশা করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যতম সেনা ও পুলিশ সদস্য প্রদানকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনসমূহের কার্যকারিতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সমুন্নত রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রস্তুতি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বজায় রেখে চলেছি। যে-কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক অঙ্গীকার প্রদান, শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যায় নারী শান্তিরক্ষী মোতায়নে আমরা সদা প্রস্তুত রয়েছি। এ প্রেক্ষাপটে নিপীড়ন সংক্রান্ত যে-কোনো অভিযোগের বিষয়ে আমরা 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলেছি।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে আশাবাদ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতীয় পর্যায়ে

জলবায়ু সংবেদনশীলতার দিকে লক্ষ্য রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় আমরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্ভাবনার প্রতি আমরা আস্থাশীল। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে আগ্রহ–আলোচনার ক্ষেত্রে আছে পিস প্রাইজ। এবার বাংলাদেশেও আলোচনা হালে বাতাস পেয়েছে। সরকারি দলের সমর্থকদের একটি অংশ বলছে, মাত্র দুই সপ্তাহে চার লাখের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নোবেল শান্তি পুরস্কারের শক্তিশালী দাবিদার। ইতিমধ্যে নোবেল পুরস্কার কমিটির কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে শেখ হাসিনার নামও। অবশ্য কয়েক বছর ধরেই নোবেল পুরস্কার মনোনয়নের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম থাকার কথা দাবি করে আসছে দেশবাসী।

মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় প্রদানে সরকারের সব পদক্ষেপের প্রতি স্থানীয় জনগণ সর্বাত্মক সমর্থন দিচ্ছে। প্রায় দুই লক্ষ শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেখানে তারা বসবাসের জন্য ভালো পরিবেশ পাবেন। শেখ হাসিনার সরকার রোহিঙ্গাদের মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশ্রয় প্রদান করেছে। কারণ বাংলাদেশের জনগণেরও এ ধরনের শরণার্থী হওয়ার মতো অভিজ্ঞতা রয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার যদিও তাদের অবস্থানকে স্বস্তিদায়ক করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, তবুও রোহিঙ্গারা আশ্রয়-কেন্দ্রগুলোতে খুবই অমানবিক ভাবে অবস্থান করছে। জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটরি জেনারেল এবং ইউ এন এফ পি-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নাতালিয়া রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করায় এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী উদারতা দেখিয়েছেন। নিজের সন্তানের মতো রোহিঙ্গাদের কোলে তুলে নিয়েছেন। সাড়ে চার হাজার রোহিঙ্গা পড়ে আছে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে। ওদের জন্য শেখ হাসিনা দরজা খুলে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার কারণে বাংলাদেশকে সারা বিশ্ব সম্মান করছে। শেখ হাসিনাকে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। আর কোন দেশ আশ্রয় দেয়নি। ভারতের মতো দেশ, যে দেশ চিরকাল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়, সেই দেশও রোহিঙ্গাদের জন্য দরজা বন্ধ করে রেখেছে। রোহিঙ্গাদের কোনো সুনাম নেই এই কারণেই এরা অবহেলিত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজের সন্তানের মতো রোহিঙ্গাদের কোলে তুলে নিয়েছেন। এবং যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। শেখ হাসিনা বলেছেন রোহিঙ্গা শিশুরা যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। মিয়ানমার সরকার নিজের মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে এর বিচার হতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গণহত্যা, গণধর্ষণ ও শিশু হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন রোহিঙ্গা নারীরা। প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, সু চি যদি রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে না পারেন তবে তার উচিত হবে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানো। রোহিঙ্গাদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তার তুলনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাড়া অপ্রতুল–অশ্রুসিক্ত ও বেদনাহত বলেই রোহিঙ্গারা শেখ হাসিনার কাছে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন।

কেউ মিয়ানমার সেনাদের হাতে স্বামীকে হত্যা, কেউবা ভাই হত্যা, কেউ কেউ গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা দিয়েছেন। মিয়ানমার সরকারের মদদে সে দেশের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে এর বিচার না হলে পৃথিবীতে এ ধরনের গণহত্যার ঘটনা আরও ঘটবে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে অবশ্যই এর বিচার হতে হবে। এ জন্য বাংলাদেশে যত তথ্য ও দালিলিক প্রমাণ আছে সেগুলো বিচারের সহায়তার জন্য প্রয়োজন হবে। ভাবতে অবাক লাগে, মুসলমানদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে অথচ কয়েকটি মুসলিম দেশ কিছুই করছে না। মিয়ানমারের রাখাইন থেকে প্রতিদিনই বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছেন নিপীড়িত ও নির্যাতিত রোহিঙ্গারা, মানবিক রাষ্ট্রের পরিচয় দেওয়া বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির। তাদের আশ্রয় ও খাবারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছে বাংলাদেশ। চেষ্টা চলছে উপযুক্ত মর্যাদা ও নিরাপদ পরিবেশে তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর কার্যক্রম। আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় জোর কূটনৈতিক লড়াই চালাচ্ছে বাংলাদেশ। বর্তমানে রোহিঙ্গার ভার বহন করা বাংলাদেশ চায় সব রোহিঙ্গার প্রত্যাবর্তন। মিয়ানমারকে ফিরিয়ে দিতে চায় তার সব নাগরিক। কোনো ধরনের তিক্ততাও চায় না প্রতিবেশির সঙ্গে। দীর্ঘ দিন দ্বিপক্ষীয়ভাবে আলোচনার চেষ্টা করে মিয়ানমারের সাড়া না পাওয়ায় এখন জাতিসংঘের দ্বারস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। তবে মিয়ানমার নতুন করে আলোচনায় আগ্রহী। তাতেও আপত্তি নেই বাংলাদেশের। মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকারের নেত্রী অং সান সু চি ১৯৯২-এর চুক্তি অনুসারে যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের কথা বিভিন্ন মাধ্যমে বলেছেন সেটা নীতিবাচক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে অং সান সু চি সাক্ষাৎকারে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে সরাসরি কোনো প্রস্তাব দেয়নি। ১৯৯২ সালের চুক্তি অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়া হবে বলে সু চির বক্তব্য সম্পর্কে শাহরিয়ার আলম বলেছেন, রোহিঙ্গা ফেরত নেওয়ায় চুক্তিটি মিয়ানমারই কখনো বাস্তবায়ন করেনি।

অতীতে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে মিয়ানমারকে বারবার আলোচনার টেবিলে ডাকলেও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখন নতুন করে বাংলাদেশে যে সব

রোহিঙ্গা প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে অনেক শিশু এবং অনেক ব্যক্তিদেরও পরিচয় নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে তার বক্তব্যে যে পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে বিশ্বে যেভাবে প্রস্তাব হয়েছে তাতে শেখ হাসিনার এসব প্রস্তাব কতটা সাড়া পাবে? এই প্রস্তাবের ইতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এবং একইভাবে এগুলো এচিভেবল এই অর্থে যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এগুলো করা যেতে পারে এবং করার দাবি করেছেন। সেই অর্থে এগুলো সুস্পষ্ট কিন্তু এইগুলো অবশ্যই নির্ভর করবে বৈশ্বিক রাজনীতির ওপর। প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, মিয়ানমারে একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পাঠানো। সেই চেষ্টা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে। পরবর্তীতে হিউম্যান রাইটস কমিশনের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু মিয়ানমার তাদেরকে যেতে দেয়নি এবং সাম্প্রতিককালে এমন কি অং সান সু চির বক্তবের পরেও মিয়ানমারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। আর সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট নিঃশর্ত এবং দ্রুত বাস্তবায়ন। সেই বিষয়ে ঐকমত্য আছে। ফলে দুটো বিষয়ে ঐকমত্য আছে এইগুলো নিয়ে হয়ত বাংলাদেশ চাপ দিতে পারে। বাকি যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো নির্ভর করছে স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য অন্যদের উদ্যোগ সেই উদ্যোগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে এক ধরনের পেশার রাইজেশন হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বজনমত গঠনে এখন পর্যন্ত কূটনৈতিক তৎপরতা খুব একটা গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে যে সব প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সে প্রতিক্রিয়াগুলো কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত যেমন–ব্রিটেনের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয়েছে কিংবা যারাই সমালোচনা করেছে এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দ্রুত ব্যবস্থার কথা বলেছেন–এইগুলো কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত।

স্রোতের মতো প্রতিদিনই বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করছে। এক দিনের জন্যও তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়নি। বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার ১৪৩ কিলোমিটার স্থল সীমানার অন্তত ২০টি পয়েন্ট দিয়ে নানা কৌশলে আসছে তারা। আরাকান রাজ্যেইবা এখন কত রোহিঙ্গা অবস্থান করছে তারও স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই কারও কাছে। বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা

প্রায় ১২ লক্ষ ছাড়িয়েছে। ষাটের দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে আসা রোহিঙ্গা রয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ্য সব মিলিয়ে এখন বাংলাদেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও উপরে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংস ঘটনার পর প্রায় ৭ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের সরকার রোহিঙ্গা নিরসন কর্মসূচি চালু করেছে। কত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করছে তা নিরসন কার্যক্রম থেকে বলা যাবে। রোহিঙ্গার মোট সংখ্যা কত তা নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনেও রয়েছে বিভ্রান্তি। কার্যক্রমের এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ রোহিঙ্গার নিবন্ধন হয়েছে। নিবন্ধনে সাড়া দিচ্ছে না রোহিঙ্গারা। তাদের পরিচয়পত্রে জাতীয়তায় রোহিঙ্গা শব্দটি থাকায় তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাই নিবন্ধন প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়েও শংকা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দানকালে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেই প্রস্তাবে বলেছেন, (১) মিয়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করা (২) মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল পাঠানো (৩) জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান এবং মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা (৪) রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িতসহ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। (৫) কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সাধারণ পরিষদে আবেগাপ্লুত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রতিনিধিদের বলেছেন, এ মুহূর্তে আমাদের চোখে ভেসে উঠছে ক্ষুধার্ত এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি। আমি কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গার সঙ্গে দেখা করেছি–যারা জাতি নিধনের শিকার হয়ে আজ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্যমতে, তিন সপ্তাহে বাংলাদেশে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার শরণার্থী এসেছে। জাতিগত নিধনের শিকার এসব রোহিঙ্গা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমারে বসবাস করে আসছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন তা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ১৭ মিনিটের ভাষণের সময় নয় বার করতালি দিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জাতিসংঘে রোহিঙ্গা সমস্যা সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এর সমাধানে গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কার্যত তার রাষ্ট্রনায়কোচিত স্বভাবের প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের উপর চেপে বসা সমস্যার বিষয়ে বিশ্বসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে মানবিক এ সমস্যার সমাধানে দায় যে জাতিসংঘের, তা সফলভাবে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ সমস্যার সমাধানে বিশ্বসম্প্রদায়কে এখন এগিয়ে আসতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা যেহেতু এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে, সেহেতু আঞ্চলিক শান্তির স্বার্থেও বিষয়টি দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ দরকার। মিয়ানমার তার জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে জাতিগত নিধনের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা থেকে সরে আসবে এমনটি কাম্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নাফ নদের উপকূলে ভেসে আসা একটি শিশুর লাশের ছবি দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতিগত নির্মূলের শিকার থেকে রক্ষা পেতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার চেষ্টা করা বহু রোহিঙ্গা শিশু, নারী, পুরুষের লাশ ঢেউয়ে ভেসে উপকূলে এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মানবতা।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখে আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি যারা 'আরসা' নামে পরিচিত তারা একযোগে মিয়ানমারের ৩৪টি সামরিক চৌকিতে আক্রমণ করে। এতে আরসার সাত শতাধিক সদস্য অংশ

নিয়েছিল যাতে সামরিক বাহিনীর ১২ জন সদস্য ও ৮৭ আরসা সদস্য নিহত হয়েছিল। এর পর থেকেই মিয়ানমার সামরিক বাহিনী শুরু করেছে রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞ। ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়াই প্রমাণ করে সেখানে জাতিগত নিধন হচ্ছে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশ আর মিয়ানমারের সীমান্তের মাঝখানে 'নো-ম্যান্স ল্যান্ড'-এ বসে বাংলাদেশে ঢোকার অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মিয়ানমারের উচিত এদের ফিরিয়ে নেওয়া, নাগরিকত্ব দেওয়া, এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এদের মানবাধিকার লংঘন না করা। কিন্তু তা যদি না করে মিয়ানমার, তবে জাতিসংঘ চাপ দিক, দাতা দেশগুলো চাপ দিক, বন্ধু দেশগুলো বলুক, তাতেও যদি কাজ না হয় তা হলে মিয়ানমারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলুক সবাই। আর কেউ না দিক রোহিঙ্গাদের দায়িত্ব অন্তত বাংলাদেশ নেবে।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ। এত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের জায়গা দেওয়ার, ভাত-কাপড় দেওয়ার, মাথার ওপর ছাদ দেওয়ার সামর্থ এ দেশের নেই। তারপরও নিকটতম প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নির্যাতিত মানুষকে এ দেশের কোলে আশ্রয় দিয়েছে মানবতার মানসকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলেই মিয়ানমার সরকারের মতো নিষ্ঠুর হতে পারত, শরণার্থীদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারত, এদের বিদায় করে দিতে পারত। কিন্তু মিয়ানমারের মতো অসভ্য দেশকে কেন বাংলাদেশ অনুসরণ করবে? যে দেশে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী, সে দেশ কি এত নিষ্ঠুর

হতে পারে! কখনো না। বাংলাদেশ অনুসরণ করবে সভ্য দেশকে। অনুসরণ করবে নেদারল্যান্ডকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে সভ্য দেশের কাতারে দাঁড়াবার সুযোগটা পেয়েছেন।

বর্তমানে নিরপরাধ রোহিঙ্গাদের উপর আরাকান বিদ্রোহী জঙ্গি সন্দেহে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বসতবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণ, লুটপাটের সঙ্গে গণহত্যায় মেতে উঠেছে সামরিক বাহিনী। মেশিনগান আর বন্দুকের ছোড়া গুলিতে অসংখ্য রোহিঙ্গা নিহত হচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত শরীরে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে সাগরে। রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূলের এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। সাত শতাব্দির ষাটের দশক থেকেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কখনো কখনো তা মারাত্মক রূপধারণ করেছে। মিয়ানমার সরকার এদের নাগরিক বলে স্বীকার করতে নারাজ, যদিও এক সময় তাদের ভোটাধিকার ছিল। সংসদ এমন কি সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছে রোহিঙ্গারা। সপ্তম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি মিয়ানমারে আসা শুরু করেছিল। এরা মূলত ছিল আরবের নাবিক, ব্যবসায়ী ও যাযাবর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরাকানে তথা বর্তমানে রাখাইন প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে এদের নেতৃবৃন্দ রাখাইন প্রদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আটচল্লিশে ব্রিটিশের কাছ থেকে মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভ করলে রোহিঙ্গারা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে ধীরে ধীরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ষাটের দশকে সামরিক জান্তা নেউইন ক্ষমতা দখল করে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের দমনের নামে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নির্যাতন শুরু করে। বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যাটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সরকার। বিভিন্ন সময় সামরিক নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে আসা ৫ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি বাংলাদেশে বসবাস করছে। আর এবারের সামরিক অভিযানে প্রায় ৮ লক্ষ রোহিঙ্গা এ দেশে প্রবেশ করেছে। এত বিপুল জনসংখ্যাকে দীর্ঘদিন লালন-পালন করা এ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া এ অনুপ্রবেশ দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এত ঝুঁকির পরেও মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে বর্তমান

সরকার। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা নিজে ছুটে গেছেন শরণার্থী শিবিরে তাদের সান্ত্বনা ও সহযোগিতার আশ্বাস দিতে। কক্সবাজারের উখিয়ায় বালুখালীর পাহাড়সহ আশপাশের প্রায় ২ হাজার একর বনভূমিতে গড়ে তোলা হয়েছে রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন আশ্রয়শিবির, দেওয়া হচ্ছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা ও চিকিৎসা সুবিধা। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ দিয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটছে বাংলাদেশে, সকল রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভালোবাসার দু হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন।

উখিয়ার বালুখালীর তেলিপাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে খালপাড় ও পাহাড়ের পাদদেশে দুই হাজারেও বেশি রোহিঙ্গা তাঁবুতে দশ হাজার মানুষের বসবাস। যেখানে বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢলে লণ্ডভণ্ড হয়ে চলছে আশ্রয় শিবিরগুলো, কোথাও কোথাও হাঁটু পানি। এমন কিছু তাঁবু রয়েছে সেখানে গলা পানিতে তলিয়ে গেছে। ভেসে গেছে তাদের ত্রাণসামগ্রীসহ তাঁবুর অন্যান্য জিনিসপত্র, তাদের অনেকেই এসে আশ্রয় নিয়েছে রাস্তার ধারে। কেউ কেউ চলে গেছে পাহাড়ের আরও গহিনে। এ চিত্র শুধু বালুখালীর তেলিপাড়ায় নয়, থাইখালী, পালখালীসহ পাহাড়ি সব ঢালুতে আশ্রয় শিবিরে নেমে এসেছে দুর্ভোগ। সবারই রান্নাবান্না বন্ধ। ত্রাণের জন্যও তারা মহাসড়কে অবস্থান নিয়েছে। উখিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত পুরোপুরি মানবিক বিপর্যয়ে। পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের তাঁবু ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত ঘোরাঘুরি করতে শুরু করেছে। অন্যদিকে বান্দরবানের এলাকায় আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সরিয়ে কুতুবপালং। ও বালুখালিতে সরকারি বরাদ্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মিয়ানমারের বুসিদং থেকে অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে ২০ দিনে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করলেও কোথাও আশ্রয় মিলছে না। পালিয়ে আসার সময় তাদের বহরে ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা। পথিমধ্যে তারা কয়েক দফা আক্রমণের শিকারও হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া একটি রোহিঙ্গাও না খেয়ে মরবে না। রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বাংলাদেশ সরকার–জননেত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানেটারি ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানির জন্য গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু করেছেন।

তিনি বলেছেন, কক্সবাজার বালুখালী পাল বাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে ৫০০ স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও ২০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের কাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অবশেষে গ্রহণ করল শেখ হাসিনার নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিক্ষিপ্তভাবে ত্রাণ বিতরণ হয়েছিল কিছুদিন। এতে সড়কে যেমন যানজটের সৃষ্টি হয়, তেমনি শরণার্থীদের বড় একটি অংশই ছিল ত্রাণবঞ্চিত।

রোহিঙ্গা নিধন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক গণআদালতের রায়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন–মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক গণআদালতের রায়ের আইনগত ভিত্তি না থাকলেও এর প্রভাব রয়েছে। এই রায় রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বিশ্বে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। যদিও গণআদালতে প্রতীকী বিচার হয়েছে, বিচারকেরা প্রতীকীভাবেই আইসিসির বিধানগুলো অনুসরণ করেছেন, এর উদ্দেশ্য ছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল যাতে আন্তর্জাতিক আইনের বিধানগুলো অনুসরণ করে সু চিসহ মিয়ানমারের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। এ গণআদালতের রায়ের আইনগত ভিত্তি না থাকলেও প্রতিটি আন্তর্জাতিক প্রচারে জনমত সৃষ্টিতেও প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। যেখানে গণহত্যার বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালত আছে সেখানে আন্তর্জাতিক বিশ্বের

উচিত সেই স্থায়ী আদালত অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মিয়ানমারের নেতৃবৃন্দের বিচারের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। রোম স্ট্যাটিউটের ১৩ অনুচ্ছেদের ধারা অনুযায়ী আইসিসিতে মিয়ানমারের গণহত্যার বিচার করার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইসিসির প্রসিকিউশন বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গণহত্যাকারী মিয়ানমার রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে বিচারের বিষয়টি নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা তদন্ত শুরু করতে পারে।

মিয়ানমার যে তাদের দেশে গণহত্যা চালাচ্ছে গণআদালতের এই রায় তার প্রতিফলন। এই রায়কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরালোভাবে তুলে ধরতে পারে। জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল এ বিষয়ে ভূমিকা নিতে পারে। মিয়ানমারে সংঘটিত গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের বিচারের জন্য রুয়ান্ডা যুগোশ্লাভিয়ার মতো ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যেতে পারে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের কাছে দাবি থাকবে মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও এই রকম ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হোক। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মিয়ানমারে যা হচ্ছে তা জেনোসাইডের অন্তর্ভুক্ত। মিয়ানমার জেনেভা কনভেনশন লংঘন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের উচিত হবে এই গণহত্যা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে অবরোধ আরোপ করা। শেখ হাসিনা বলেছেন, রুয়ান্ডা, যুগোশ্লাভিয়া ও কম্বোডিয়ার মতো ট্রাইব্যুনাল গঠন করে মিয়ানমারের এই গণহত্যার বিচার হচ্ছে না বলে মালয়েশিয়ায় গণআদালত বসেছে। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে। আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে তারা অপরাধ করেছে।

শেখ হাসিনা আরও বলেছেন–রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ববিবেক যদি জাগ্রত না হয়, তা হলে এই সংকটের সমাধান হবে না। এই সমস্যার সমাধান না হলে এই অঞ্চলে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে পারে। ১৯৭১ সালে ভারত আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলে আমরা নয় মাসে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। রোহিঙ্গা সমস্যায় আমরা ভারতের কাছে তেমন সহযোগিতাই আশা করছি। রোহিঙ্গা আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে শান্তির দূত ও বিশ্বের অন্যতম মানবতাবাদী নেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বিশ্বকে, জাতিসংঘকে আমাদের বিষয়টি দেখতে হবে যে, আমরা কতটুকু আশ্রয় দিতে পারি।

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গণআদালতের এই রায় বিশ্বের জনমত সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখবে। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত এই আদালতের রায় যার প্রতি সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের সমর্থন থাকবে। রাখাইন অঞ্চলে চলমান গণহত্যা, জাতিগত নিধন, হত্যা ও ধর্ষণের নিন্দায় এই রায়টি সারা দুনিয়াতেই একটি দলিল হিসেবে মর্যাদা ও গুরুত্ব পাবে। এমন একটি আদালত ষাটের দশকের শেষদিকে বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ভিয়েতনাম যুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে গঠন করেছিলেন। এই আদালতটি আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহ সব চিত্র তুলে ধরেছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও অং সান সু চি ও গণহত্যার জন্য দায়ী তার জেনারেলদের বিচার আইসিসিতে হওয়ার প্রস্তাব করেছেন। এ প্রস্তাবের আইনগত, পদ্ধতিগত ও অন্যান্য সব প্রাসঙ্গিক দিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সহিংসতার কারণে গত কয়েক বছর ধরে রোহিঙ্গারা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। ২০১৭ সালের আগস্টের শেষে নতুন করে সহিংসতা তৈরি হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী ২৫ আগস্টের পর থেকে প্রায় আট লাখের বেশি রোহিঙ্গা মুসলিম মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ফলে এই বিশাল সংখ্যক রোহিঙ্গার তাঁবু ঘর করে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাটা বাংলাদেশের জন্য রীতিমতো চ্যালেঞ্জ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা শরণার্থীদের ব্যাপারে মানবিক। তাদের যোগাযোগের ব্যাপারেও আন্তরিক। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীক্যাম্পে টেলিটকের বুথ বসানোর জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব বুথ থেকে রোহিঙ্গারা মোবাইল ফোনে কথা বলার সুযোগ পাবে। খুব কম মূল্যে তাদের সেবা দেওয়া হবে।

বিশ্বে কারও শান্তির দর্শন নেই। একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জাতিসংঘের ১৯৪ রাষ্ট্র স্বীকৃত শান্তির দর্শন জনগণের ক্ষমতায়ন। রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, নোবেল লারিয়েট নয়, দরকার নোবেল ওয়ার্কার। তাই সারা বিশ্ববিবেক বলছে,

জাতির জন্য লারিয়েট প্রয়োজন নেই। দরকার রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার মতো ওয়ার্কার। শেখ হাসিনাকে ব্রিটিশ মিডিয়া মাদার অব হিউম্যানিটি খেতাবে ভূষিত করেছে।

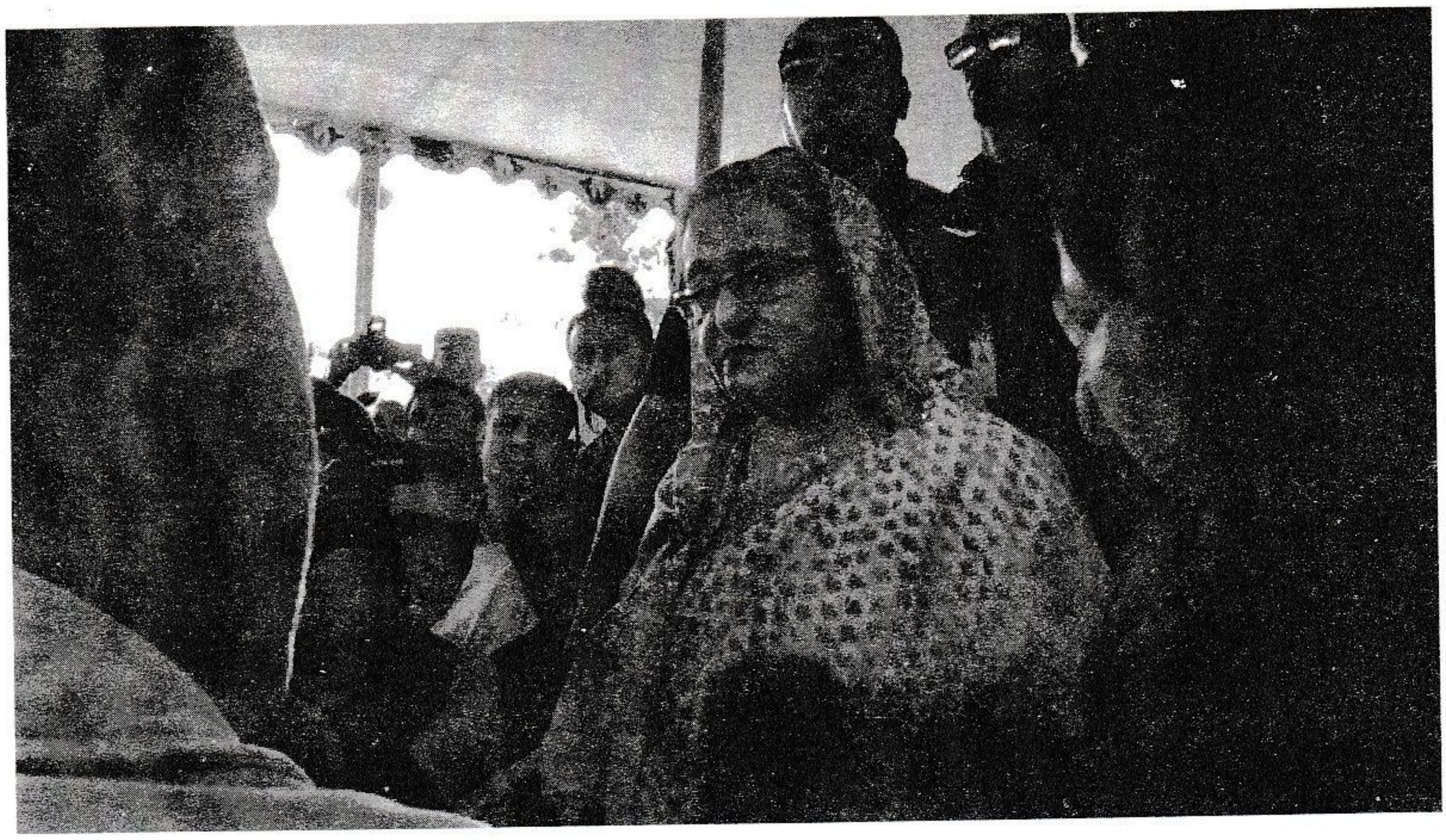

বর্বর নির্যাতনের কারণে ২৫ আগস্ট ২০১৭-এর পর মিয়ানমারের রাখাইন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে জাতিসংঘসহ বিশ্বসম্প্রদায় মনে করে, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের জাতিগত ভাবে নির্মূলের চেষ্টায় রয়েছে। বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা যেন বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসতে না পারে এ জন্যই সীমান্তে স্থলমাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সব আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে বাংলাদেশ সীমান্তসংলগ্ন রাখাইনের বিভিন্ন এলাকায় ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে দুই ব্যাটালিয়ন সেনা মোতায়েন রেখেছে মিয়ানমার। এ পর্যন্ত প্রায় ১৯ বার মিয়ানমার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে রোহিঙ্গা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দানের জন্য পাঠ্যপুস্তকে রোহিঙ্গা নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

কক্সবাজার ও বান্দরবানের বিভিন্ন অস্থায়ী কাম্পে আশ্রিত ৭০ হাজার শিশুকে টিকা দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। গর্ভবতী নারী, অসহায় শিশুসহ অসুস্থ রোহিঙ্গাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ক্যাম্প

এলাকা ১২টি ব্লকে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেডিকেল টিম কাজ করছে বলে সংসদীয় কমিটিকে অবহিত করেছে স্বাস্থ্য আইন দফতর। ক্যাম্প এলাকায় সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন এনজিওসহ স্বাস্থ্য সেবায় প্রাপ্ত সব ত্রাণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৮তম বৈঠকে এসব তথ্য জানানো হয়।

শেখ হাসিনার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রাণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয় সেনাবাহিনী। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ত্রাণ সামগ্রী জমা দিচ্ছে। উখিয়া ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাসে সেনাসদস্যরা সরকারি ও বেসরকারি সব ত্রাণ গ্রহণ করছেন। উখিয়া ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাসে তিনটি নিবন্ধন বুথ তৈরি করে দশজন সেনাসদস্য ত্রাণদাতাদের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করছেন। তালিকা তৈরি করে ত্রাণ সামগ্রী গৃহীত মর্মে দাতাদের রসিদ দিচ্ছেন। তবে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থাগুলোর এসব বিতরণে কোনো বিধি-নিষেধ নেই সেনাবাহিনী সদস্যদের। উখিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পাহাড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রায় দশ হাজার রোহিঙ্গা বসবাস করছে। তাদের জন্য কুতুপালং ও বালুখালীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ হাজার একর জমিও বরাদ্দ করেছেন। সেখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে পাহাড় ও বনভূমিতে নিজেদের মতো করে আশ্রয়-শিবির বানিয়েছে। শেখ হাসিনা এই সকল রোহিঙ্গাদের একটি প্লাটফর্মে নিয়ে এসেছেন।

ইতিমধ্যে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করা রোহিঙ্গার সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। রাখাইনে সন্ত্রাস বন্ধ ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সু চির আশ্বাস সত্ত্বেও থামেনি রোহিঙ্গা নির্যাতন। বর্মি সৈন্য ও মগ রাজাকাররা রাখাইন রাজ্যকে রোহিঙ্গাশূন্য করতে আরও জোরে সোরে চালাচ্ছে নির্যাতন-নিপীড়নের স্টিম রোলার। তাদের কবল থেকে প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিনই বাংলাদেশে আসছে হাজার হাজার রোহিঙ্গা। এদের বেশিরভাগই উখিয়ায় আঞ্জুসান পাড়া, টেকনাফের হোয়াইক্যাং লাশাবিল ও শাহপরীর দ্বীপ দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। বাংলাদেশে আগত এই সকল রোহিঙ্গাদের

বিপুল সংখ্যাকেই অসুস্থ। তাদেরকে কক্সবাজার হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঙ্গু হাসপাতাল থেকে ১০ জন সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসককে কক্সবাজারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

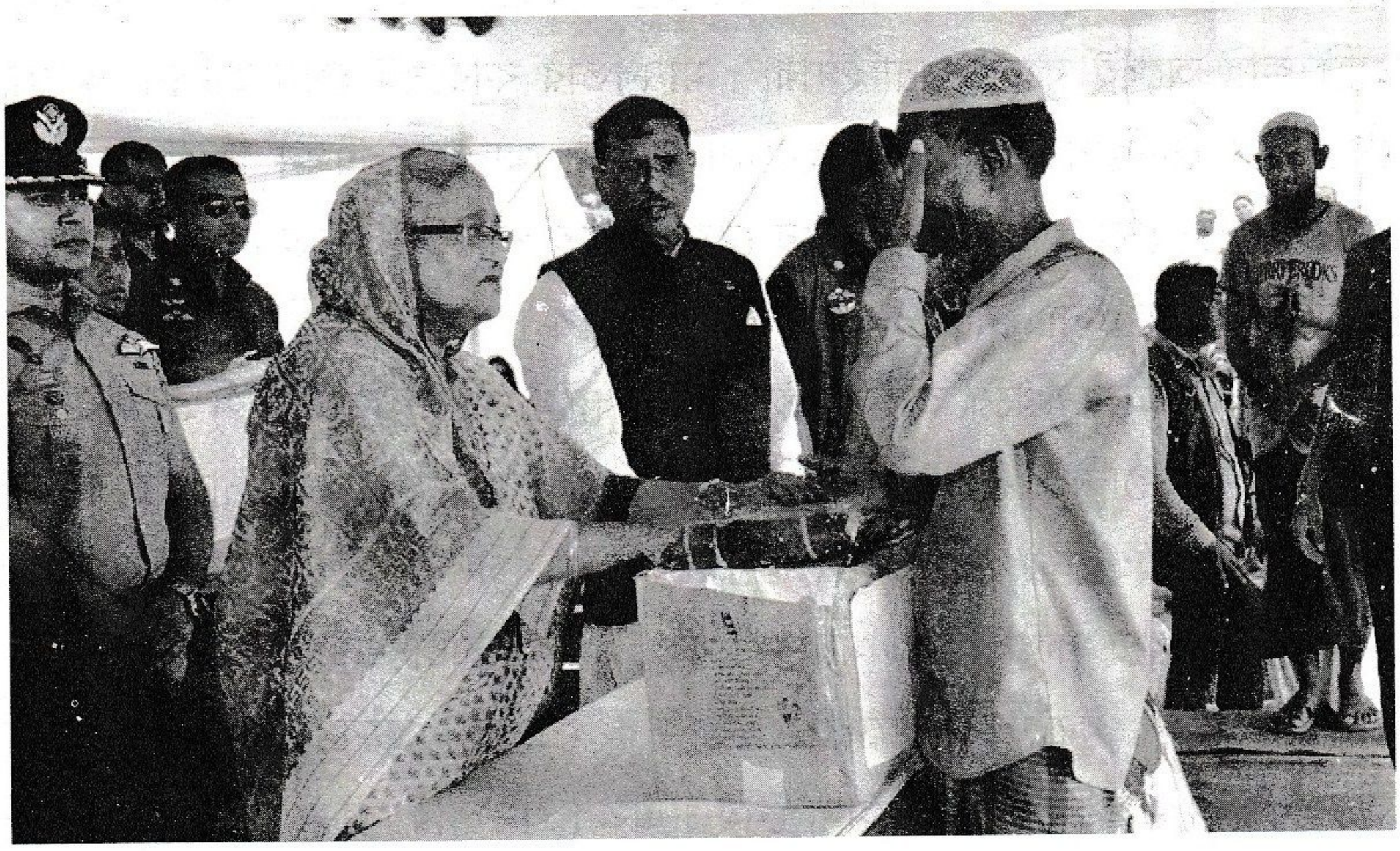

যখন মিয়ানমারে গণহত্যা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, চীন ভারত রাশিয়া মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ তার আবেগ অনুভূতি নিয়ে শরণার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ কোটি মানুষের সঙ্গে ১১ লক্ষ শরণার্থীর খাবার ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা দিয়ে জাতিসংঘসহ এই গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে, কফি আনান কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করে শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মিয়ানমারের গণহত্যার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সাহসী ভূমিকা ও নেতৃত্ব বিশ্বমানবতার কাছে প্রশংসিত হয়েছে, অভিনন্দিত হয়েছে। পশ্চিমা গণমাধ্যম তাকে মানবিক মা বা মানবতার জননী বলেছে। শুরু থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যার এই দৃঢ় অবস্থানের প্রশংসা হয়েছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে অনন্য দৃষ্টিস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধি ধারণকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রবেশ করে প্রত্যেকের

কাহিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। মিয়ানমারের আর্মির গুলিতে আরাকানের লাবানা গ্রামের নয় বছর বয়সী একটি মেয়ে আনাসের নাক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এই আনাসকে ধরে দাঁড়িয়ে নির্যাতনের কথা শোনেন তিনি। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ভূমিকায় সত্যিকার অর্থেই কৃতজ্ঞ রোহিঙ্গারা। মানবতার কারণেই শেখ হাসিনা আশ্রয় দিয়েছেন রোহিঙ্গাদের। শেখ হাসিনা বলেন, মানুষের এমন বিপদের কথা শুনে আমরা তো আর তাদের দূরে ঠেলে দিতে পারি না। যত দিন মিয়ানমার তাদের ফিরিয়ে না নেবে আমরা আশ্রয় দেব। তবে, রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বক্তব্য দিলেও সু চি সরকার ঢাকাকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়নি। সু চি বলেছেন, ১৯৯৩ সালের চুক্তির ভিত্তিতে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়া হবে। ওই চুক্তিতে ৯৪ হাজার রোহিঙ্গা ফেরত নেওয়ার কথা ছিল মিয়ানমারের। কিন্তু তারা ওই কথাও রাখেনি। এদিকে নতুন করে বাংলাদেশে যে সব রোহিঙ্গা ঢুকেছে তাদের মধ্যে অনেকের নাম পরিচয় বা ঠিকানা নেই। এসব সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা নেওয়ার প্রয়োজন হবে। স্টেট কাউন্সিলের রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। মুসলমান ছাড়াও অন্য জাতিগোষ্ঠি যেমন, রাখাইন স্রো দাইংনেট ও স্রামাগাইয় ও হিন্দু সংখ্যালঘু পুনর্বাসন বর্মসুচির ওপরও জোর দিয়েছেন সু চি।

রোহিঙ্গা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী উদ্যোগ দেশ-বিদেশে প্রশংসিত রয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চরম বিপদে পড়ে বাংলাদেশে স্রোতের মতো রোহিঙ্গারা আসছে। সন্তানহারা মায়ের, স্বামীহারা নববধূর আর ভাইহারা বোনের আর্তনাদে কক্সবাজারের আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মানবিক দিক বিবেচনা করে শেখ হাসিনা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের প্রতি সহিংসতা ও তাদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দেশটির নেত্রী অং সান সু চির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শান্তিতে নোবেল জয়ী সু চির সমালোচনা করে তিনি বলেন এই সময়ে সুচি

অন্যতম অনুপ্রেরণীয়, শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে সু চির প্রতি আহ্বান জানান। মিয়ানমারে বর্তমানে মানবাধিকারের অপব্যবহার হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাকে বর্বরতা আখ্যায়িত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন এখনই সময় রোহিঙ্গা নির্যাতনের বন্ধে নৈতিক পুঁজি ব্যবহারের এবং কর্তৃপক্ষকে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা রোহিঙ্গাদের জন্য দুর্ভোগ। কেউ মিয়ানমারের সামরিক শাসনের প্রত্যাবর্তন দেখতে চায় না। কেউ জেনারেলদের প্রত্যাবর্তন দেখতে চায় না। এ সহিংসতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এ নির্যাতন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এটা একটা জাতিকে নির্মূল করার চেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটা অবশ্যই থামাতে হবে। মিয়ানমার সরকারের কর্মকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য। রোহিঙ্গা ইস্যুতে সুচিকে তার অবস্থান পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের দুর্দশা এবং জাতি হিসেবে মিয়ানমারের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন–মিয়ানমারের জনগণ যতদিন নিপীড়নের শিকার হতে থাকবে, এতদিন আমি কথা বলতে থাকব।

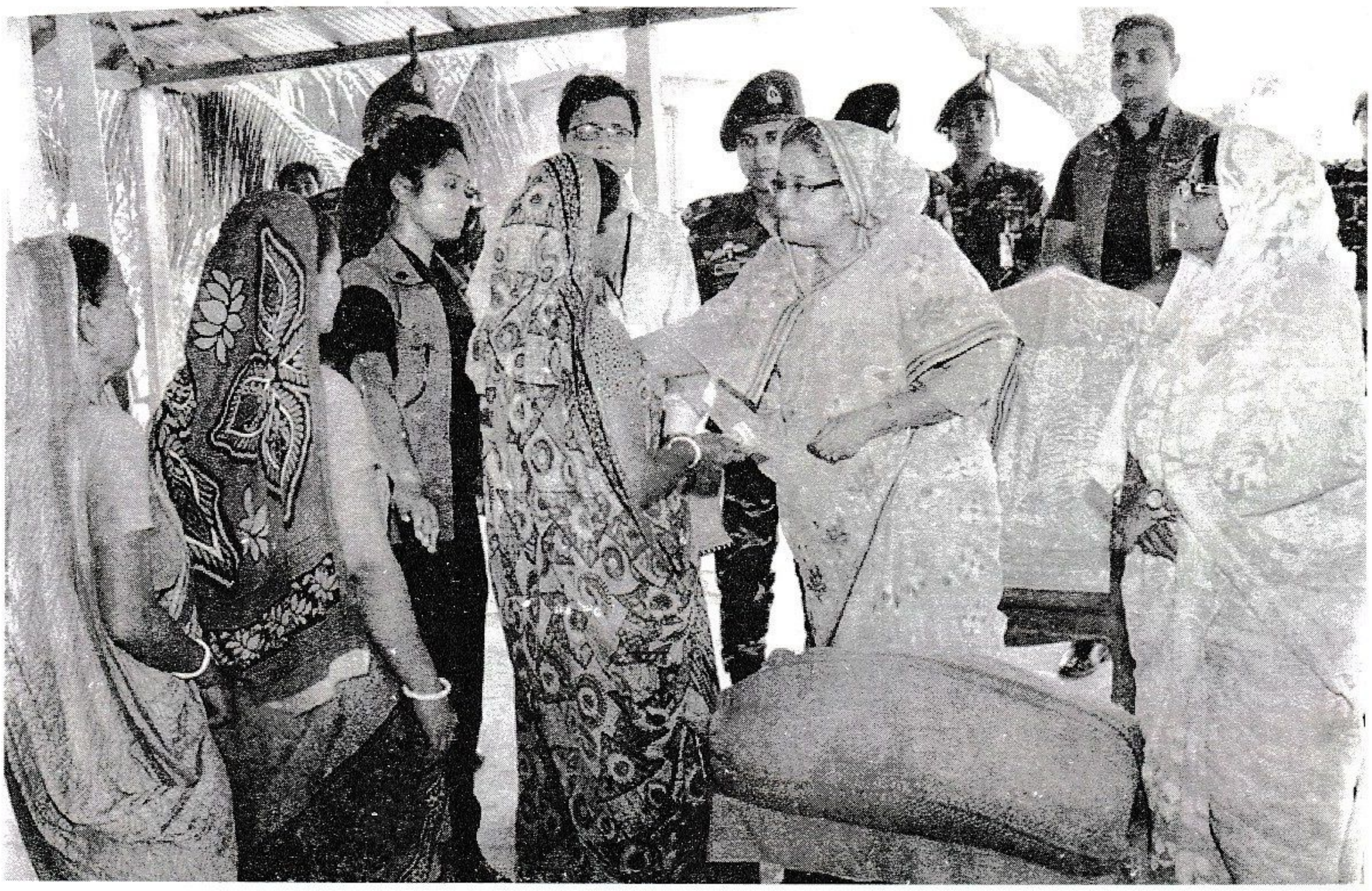

বাংলাদেশের নাফ নদের বিভিন্ন স্থান থেকে নেওয়া ছবি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে মিয়ানমারের ভিতরে বেশ কয়েকটি স্থানে ধোঁয়া উড়ছে।

জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, কয়েকটি সেনা ও পুলিশ ক্যাম্পে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলার পর থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য ছেড়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা অভিযোগ করেছেন বৌদ্ধ অধ্যুষিত মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পুরুষদের ধরে নিয়ে হত্যা করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে আর মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরই মধ্যে এ সহিংসতার শিকার হয়ে প্রায় তিন হাজার রোহিঙ্গা প্রাণ হারিয়েছেন। অ্যামনেস্টি বলেছে–মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীও আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এমন সংঘবদ্ধ দলগুলো একসঙ্গে মিলে এই জ্বালাও-পোড়াও চালাচ্ছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির মুসলিম অধ্যুষিত রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের নির্মূলের জন্য স্কর্চড আর্থ কৌশল অবলম্বন করছে বলে জানিয়েছেন অ্যামনেস্টি। এ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যারা পালাতে চাইছে তাদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। সামরিক পরিভাষায়, স্কর্চড আর্থ নীতি হচ্ছে একটি সামরিক কৌশল। এ কৌশল অনুসারে সেনারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এগিয়ে যাওয়ার সময় 'শত্রু' সেনাদের হত্যার পাশাপাশি সব কিছু পুড়িয়ে দেয়। শত্রুর পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব এমন স্থাপনা ও অবকাঠামো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যেমন খাদ্যের উৎস, পানি সরবরাহ, পরিবহন যোগাযোগ, শিল্প কারখানা এমন কি স্থানীয় জনসাধারণ। এ কৌশল সেনাবাহিনী 'শত্রু' ভূমিতে অথবা নিজেদের নিয়মিত ভূ-খণ্ডের ব্যবহার করতে পারে। শত্রুর সম্পদ ধ্বংস করার কৌশলের চেয়ে স্কর্চড আর্থ ভিন্ন। এ কৌশলটি একেবারেই কৌশলগত এবং রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হয়। অতীতে রাশিয়ার সেনাবাহিনী এ কৌশল ব্যবহার করেছে। মার্কিন গৃহযুদ্ধে কৌশলটি ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত অভিযানে এবং চীনে এ কৌশল ব্যবহার করেছে জাপান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ এ কৌশল ব্যবহার করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। কয়েক দশকের মধ্যে শ্রীলংকা, লিবিয়া ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধেও কৌশলটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন–মিয়ানমারে সহিংসতা শুরুর পর থেকেই তারা উত্তর রাখাইনে পৌঁছাতে পারছে না, যে কারণে কি

ধরনের মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে তারও পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে না জাতিসংঘের কো-অর্ডিনেশন অব হিউম্যান অ্যাফেয়ার্সের শূন্যপাত্র বলেন হাজার কিংবা লাখো মানুষ হয়তো সীমান্ত থেকে অনেক দূরে আটকে আছে যেখানে খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহের ঘাটতি আছে এবং যেখানে নিরাপত্তা পৌঁছাতে অক্ষম। তিনি আরও বলেন, যে সব রোহিঙ্গা এখনো তাদের গ্রামেই আছেন তারাও ভয় নিয়েই বসবাস করছেন। বছরের পর বছর যে খাদ্য সাহায্য তারা পেয়ে আসছিলেন তা পেতেও তাদের কষ্ট হচ্ছে। তারা আটকা পড়ে আছেন।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যাটি পশ্চিমা বিশ্বের নজরে আসতে সক্ষম হয়েছে। আর তার মূল কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তার সাহসী নেতৃত্বের কারণে এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণেই আজ রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ব বাংলাদেশের পাশে আছে। রোহিঙ্গা সমস্যাটি প্রধানমন্ত্রী যে মানবিক দৃষ্টিতে দেখছেন, তা বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন–মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও পুলিশ সে দেশের সরকারের নির্দেশে রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেশ থেকে তাদের বের করে দিচ্ছে, লুটপাট করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, আর মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড করছে। জাতিসংঘ থেকে মিয়ানমার সরকারকে চাপ সৃষ্টি করে রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে নিজ বাসস্থানে বসবাস উপযোগী পরিবেশ তৈরির

জোর দাবি জানান প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গা শরণার্থী ইস্যুতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রিভেনশন অব সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন অন্ড অ্যাবুজ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে বক্তব্য দিয়েছেন এবং জাতিসংঘ সদর দফতরে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে ওআইসি কন্ট্রাক্ট গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা করেছেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনে তার সফরের ওপর ব্রিফ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনের পাশাপাশি নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বিষয়েও কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে চট্টগ্রাম মেডিক্যালে দগ্ধ শিশুসহ প্রায় পঞ্চাশ জন রোহিঙ্গা ভর্তি হয়েছেন। মিয়ানমারের অব্যাহত সেল অভিযানে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে তারা। টেকনাফের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সেভসিন স্যঁ ফ্রতিয়ে (এস এস এফ) হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের চট্টগ্রামে আনা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে কমিটির মাধ্যমে ত্রাণ দিয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান হত্যা-নির্যাতনের কারণে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গা সংকট এ মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যা খুব সতর্কতার সঙ্গে মোকাবিলা করছে সরকার। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকার কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুড়ি হাজার কম্বল রোহিঙ্গাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। নির্যাতনের শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলিদের দুর্দশায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের সাহায্য করার ব্যাপারে জাতিসংঘ যে আবেদন রেখেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে সমর্থন জানিয়েছেন। শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি সব মানুষই সন্ত্রাসবাদী নয়। আমরা বিষয়টি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে নির্যাতনের শিকার হওয়া রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্য দেওয়ার জন্য

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী যে সব রোহিঙ্গাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। যে সব তথ্য ও ছবি আমাদের কাছে এসেছে তা সত্যিই হৃদয়বিদারক। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সব রাজনৈতিক মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে এ চলমান সংকট মোকাবিলা করা উচিত। যারা সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিয়েছে তারা খুবই অসহায়। তারা ক্ষুধার্ত এবং অপুষ্টিতে ভুগছেন। তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি রোহিঙ্গাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন মানবিক কারণে। রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানের ক্ষেত্রে যে মূল চেতনাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া সব রোহিঙ্গার রাখাইনে নিরাপদ প্রত্যাবাসন ও বসবাস নিশ্চিত করা বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ২০১৬ সালের অক্টোবরের পর যারা বাংলাদেশে এসেছে, তাদের স্বেচ্ছায় দেশে ফেরা নিশ্চিত করতে হলে তাদের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা জরুরি। বা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর লোকজনের রাখাইন রাজ্যে কাজ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা প্রকট হওয়ার আগেই এর সামধানে ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে এক হয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বিষয়ে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্ত বায়নেও দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে ছয়টি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন। নিউইয়র্ক জাতিসংঘ সদর দফতরে রোহিঙ্গা বিষয়ে ওআইসির কনট্রাক্ট গ্রুপ সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সব কথাগুলো বলছিলেন। মিয়ানমারের জাতিসংঘের বলিষ্ঠ ও দ্রুত পদক্ষেপ চেয়েছেন মিয়ানমারের ওপর এখনই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত; রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন ও মানবিক সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়েছেন অং সান সু চি। রোহিঙ্গাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ব্যবস্থা নিতে সু চির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জয় সজিব ওয়াজেদ বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যুটি আমাদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমাদের প্রতিবেশি দেশের মানুষকে সাহায্য ও আশ্রয় দিতে পারছি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাখাইনের পরিস্থিতি নিয়ে মিয়ানমারের সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টির উসকানি রোধ করতে বাংলাদেশ সরকার সামরিক নয়, কূটনৈতিক তৎপরতায় বিশ্বাসী। রোহিঙ্গাদের সমস্যাটি জাতিগত, কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো এবং মর্যাদার সঙ্গে তাদের নিজ দেশে পুনর্বাসনই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করার জন্য দেশটিতে শান্তি নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরতেই এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দ্বিপক্ষীয় কূটনীতির সঙ্গে আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় তথা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমাধানের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আশা করি এবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যুদ্ধকে প্রধানমন্ত্রী সমাধান মনে করেন না। কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যাকে কূটনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, অন্যের সমস্যা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা বর্ডার বন্ধ করে দিয়ে এ সমস্যা এড়াতে পারতাম। কিন্তু মানবতা ও মনুষ্যত্বকে সম্মুখে স্থান দিয়ে আমরা সমস্যাটা গ্রহণ করেছি। কারণ মানবিক সংকট নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার রাজনীতি করেন।

রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে ফেরত পাঠাতে ২৩ নভেম্বর ২০১৭ মিয়ানমারের সঙ্গে সমঝোতা সই করে বাংলাদেশের সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে রোহিঙ্গাদের নোয়াখালীর ভাসানচরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের জন্য অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার। রোহিঙ্গারা এ দেশে যত দিন থাকবে, ততদিন তাদের খাদ্য ও মানবিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের ঝুপড়ি ঘরে রাতে ঠান্ডায় ঘুমাতে কষ্ট হতো, কষ্ট হতো কিশোরী রমিজা বেগমের, তার ঘরে কোনো কম্বল ছিল না। তাদের কম্বল কেনার সামর্থ ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কম্বল পেয়ে এই কিশোরীর চোখেমুখে খুশির ঝিলিক দেখা গেল। কক্সবাজার শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পূর্বে উখিয়ার কুতুবপালং শিবিরে মা ও ভাইবোনের সঙ্গে থাকে রমিজা। রমিজাসহ তিন হাজার রোহিঙ্গা প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল ও সোয়েটার পেয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন শিবিরে রোহিঙ্গাদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ করছে সেনাবাহিনী। কম্বল পাওয়া রোহিঙ্গা কিশোরী রমিজার বাড়ি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের ঢেকিবুনিয়া গ্রামে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

২৯ জানুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখে রমিজার বাবাকে গুলি করে হত্যা করে। বড় এক ভাই এখনো নিখোঁজ। এক কাপড়ে বাড়ি থেকে মা মাজেদা বেগমের সঙ্গে তারা তিন ভাইবোন পালিয়ে চলে আসে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া কম্বল পেয়ে কথা বলেছেন রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা বৃদ্ধ নূরুল ইসলাম। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখে বিকালে তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল মিয়ানমার সেনাবাহিনী। তারপর তার কিশোরী মেয়েকেও সেদিন হত্যা করেছিল। এরপর স্ত্রী, চার ছেলে ও তিন মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন তারা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই সকল ঘটনাগুলোর জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। শুধু রমেজা নয়। রমেজার মতো সাদেকার হাতে একটি কম্বল তুলে দিলেন তিনি। যেন কষ্টের মধ্যেও একটু হাসি ফুটবে। এদিকে নূর আলম, আবু হোরায়রা, মর্জিনা, রোমিজাদের হাতেও কম্বল, সোয়েটার তুলে দিলেন।

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরানোর প্রক্রিয়াটি টেকসই করতে হলে এর সঙ্গে জাতিসংঘকে যুক্ত করতে হবে। এই সমস্যার উৎস আর সমাধান দুটোই মিয়ানমারের। রাখাইনে যে রোহিঙ্গাদের বসবাসের জন্য নিরাপদ–এটা মিয়ানমারকেই নিশ্চিত করতে হবে। আর তাদের ফেরানোর প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘকে যুক্ত করার দায়িত্ব ওই দেশটিকেই নিতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে রোহিঙ্গাদের বরণ করেছেন, সেটা এক কথায় অসাধারণ। শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিশ্বসম্প্রদায় যেভাবে বাংলাদেশের ভূয়শী প্রশংসা করেছে বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থান সবার কাছে একটা দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ত্রাণ বিতরণের কাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও অবকাঠামো নির্মাণে সঠিক সহায়তা করে যাচ্ছে। মিয়ানমার না চাইলেও রেহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যুক্ত রাখতে চায় বাংলাদেশ।

রোহিঙ্গাদের রাখাইনে ফেরত পাঠানোর দায়িত্বটা কিন্তু এখন মিয়ানমারকেই নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন অবিলম্বে মিয়ানমারে সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সেখানে সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সব ধরনের তৎপরতা চালু করতে হবে। জরুরি ত্রাণকর্মীদের অবাধে সেখানে যেতে দিতে হবে। সেখানে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে রোহিঙ্গারা বুঝতে পারে তাদের ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তখন তারা নিরাপদে ফেরার ব্যাপারে আস্থা পাবে।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজ বাড়িঘরে ফিরে যেতে চাইলে উপযুক্ত প্রক্রিয়াতেই শুধু তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বাংলাদেশে আসা ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে নিয়ে ঢাকায় বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের আলোচনার পরিপেক্ষিতে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী। শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের পছন্দের বিষয়টি সমুন্নত রাখতে হবে একই সঙ্গে তাদের প্রত্যাবর্তন হতে হবে একটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল নিরাপদ ব্যবস্থায়। আর পরিস্থিতি হতে হবে উপযোগী।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রাখাইনে রোহিঙ্গা নারী-

A-99304

পুরুষ ও শিশুদের ওপর সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনা মানবতাবিরোধী অপরাধের সামিল। পাশাপাশি তিনি রাজ্যটিতে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিতে দেশটির সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে নারী ও শিশুদের ওপর সহিংসতার দ্রুত ও কার্যকর তদন্ত শুরু এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের জন্য মিয়ানমারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

মিয়ানমার থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের অস্থায়ীভাবে আশ্রয় ও জরুরি মানবিক সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে মানবিক আচরণ করেছেন, তার প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক নিরাপত্তা বৈঠকে এই প্রশংসা করেছে দেশটি।

মিয়ানমার ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছে চীন। রাখাইনে অস্থিতিশীলতা ও রোহিঙ্গাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনায় চীন উদ্বিগ্ন। রোহিঙ্গা সংকট এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে বলে চীন মনে করছে। তাই বাংলাদেশ মিয়ারমার এর সঙ্গে কাজ করে এই সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী চীন। তারা চায় দ্বিপক্ষীয় উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হোক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনের বিশেষ দূত সাম গোসিয়াংকে বলেন, মানবিক কারণে আমরা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। এক্ষেত্রে সংকট দীর্ঘায়িত হতে পারে না। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারের অঙ্গীকার এখন অনেক বেশি, জোরালো। আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইতিবাচক লক্ষণ দেখছি। আমরা মিয়ানমার অঙ্গীকারের প্রতিফলন দেখতে চাই।

মিয়ানমারের সামরিক অভিযানের মুখে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে দেশটির নেত্রী অং সান সু চির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ।

চলমান রোহিঙ্গা সংকটের মুখে মিয়ানমার সফরে যান বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি দশ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। সেই প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ফরিদ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, জননিরাপত্তা বিভাগর সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীন,

আইজিপি এ কে এম শহীদুল হক, বিজিবি মহা পরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, কোস্টগার্ড মহাপরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এ. এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী, মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সফিউর রহমান, মন্ত্রির একান্ত সচিব ড. হারুন অর রশিদ বিশ্বাস। এদিকে রোহিঙ্গা-বিরোধী প্রচারে মিয়ানমার নেত্রী অং সান সু চী উৎসাহ দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন। দেশে ফিরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সফরকালে একটি যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই কমিটিতে দুই দেশের সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে। কমিটি গঠনে মিয়ানমার সম্মত হয়েছে। এ ব্যাপারে শিগগির কাজ শুরু হবে। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরত নেবে বলেও আশা করছেন মন্ত্রী। এ ব্যাপারে মিয়ানমারের সর্বোচ্চ মহল থেকে আশ্বাস পেয়েছেন মন্ত্রী।

মিয়ানমারের বোর্ড কাউন্সিলর ও ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেত্রী অং সান সু চিকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সু চি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার নেত্রী অং সান সু চিসহ দেশটির দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে বলেছেন রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে তারা সম্মত হয়েছেন।

মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদোরে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দেশটির বোর্ড কাউন্সিলর অং সান সু চির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে তাদের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে এক ঘণ্টা কথা বলে স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৈঠকে সু চিকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সু চি সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশে আসবেন বলে জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সীমান্তে শুরু হয় রোহিঙ্গার ঢল। রোহিঙ্গাদের আসা এখনো বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যে আট লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা নতুন করে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আলোচনার মুখে সু চির দফতরের মন্ত্রী কিবাতিস্ত সোয়ে ঢাকায় এলে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে দুই দেশ একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে সম্মত হয়। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার মধ্যেই দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে পূর্ব

নির্ধারিত বৈঠকে অংশ নিতে মিয়ানমার যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কথাও সু চিকে বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সু চিকে বলেছেন বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাসী প্রশ্রয় পায় না। তবে, অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত ফিরিয়ে না নিলে এদের অনেকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারে। তখন পরিস্থিতি বাংলাদেশ বা মিয়ানমার কারও অনুকূলে থাকবে না। মিয়ানমার থেকে ইয়াবার মতো মাদক পাচার যে ভয়াবহ রূপ পেয়েছে, সে কথাও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের নেত্রীর সামনে তুলে ধরেছেন। সু চি বলেন, তার দেশের যুব সমাজও ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে ইয়াবা পাচার বন্ধে তার সরকার সীমান্ত বন্ধ করবে।

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ভারতের সুর নরম হয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্বজনমত আরও জোরদার হয়েছে। ভারত আগে রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ পাঠালেও শক্ত কোনো অবস্থানে যায়নি। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এসে বলে গেছেন মিয়ানমারকে তাদের বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে হবে। কাজেই এ ব্যাপারে ভারতও তাদের চাপ দেওয়া শুরু করেছে। এভাবে যদি বাংলাদেশের অন্যান্য বন্ধু দেশ এগিয়ে আসে–রাশিয়া ও চীন, যেটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন করছে, আমেরিকাও কঠিন অবরোধের কথা চিন্তা করছে। এভাবে সবাই এগিয়ে এলে মিয়ানমার অবশ্যই তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

চলমান রোহিঙ্গা ইস্যুতে ব্রিটিশ সরকার সংসদ সদস্য এবং যুক্তরাজ্যের জনগণ বাংলাদেশের পাশে থাকবে। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে যুক্তরাজ্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে বিশ্বাবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মানবতার দিক বিবেচনা করে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে যে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বে তা রোল মডেল–এই মানবতায় প্রধানমন্ত্রীকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করার জন্য আমি বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আলাপ-আলোচনা ও বিশ্বসম্প্রদায়ের সহযোগিতায় রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন

১৭ কোটি মানুষ বাস করে। এর ওপর বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা দেশের জন্য বড় বোঝা। দ্রুত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

রোহিঙ্গা সমস্যা আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত এবং বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর। এই সমস্যার সমাধান অনেকভাবে হতে পারে। এটি যেহেতু মিয়ানমারের নিজস্ব সমস্যা, সেহেতু মিয়ানমারকেই এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের সেনাবাহিনী ও উগ্রপন্থী বৌদ্ধদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন না হলে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করলেও এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সহজ হবে না। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের জনগোষ্ঠির অংশ মনে করে না। এ ব্যাপারে দেশটির অনেক আগে থেকেই তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু রোহিঙ্গারা মনে করে, তারা মিয়ানমারের নাগরিক এবং তাদের এই দাবিটি যৌক্তিক। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে উগ্রপন্থী বৌদ্ধরাও রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। যে কারণে তারা জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তারা কোনোভাবেই সেখানে থাকতে সাহস পাচ্ছে না। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এর আগেও যে সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে

এসেছে মিয়ানমার তাদের ফেরত নেয়নি। বাংলাদেশ বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির অংশ নয়। কিন্তু মিয়ানমার বাংলাদেশের যৌক্তিক বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়নি। বাংলাদেশ বহুবার কূটনৈতিকভাবে আলোচনা করেও সফল হয়নি। ফলে তাদের মধ্যে এমন একটি মনোভাব বা ধারণা হয়েছে, তারা প্রাথমিকভাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে মিয়ানমার থেকে বিতারিত করতে পেরেছে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে মিয়ানমারকে এর জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ এই সমস্যার কারণে বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের সমস্যা তৈরি করেছে। রোহিঙ্গাদের এই সমস্যা একটি মানবিক বিপর্যয়। এটি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হলেও এখন তা সীমানা অতিক্রম করেছে এবং আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই সমস্যার সমাধান অনেকভাবে হতে পারে। এটি যেহেতু মিয়ানমারের নিজস্ব সমস্যা সেহেতু মিয়ানমারকেই এই সমস্যা সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির জাতির উদ্দেশে ভাষণ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে ভাষণের পর এই সমস্যা সমাধানে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। আসিয়ানও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ ১৯৯৭ সালে মিয়ানমার আসিয়ানের সদস্য হওয়ার পর থেকেই অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তাই মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে আসিয়ান এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া ইতিমধ্যে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে মানবাধিকার রক্ষা বা দ্বন্দ্ব নিরসনের কাজে আসিয়ান অধিকমাত্রায় গুরুত্ব দিচ্ছে। জাতিসংঘ এই সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়া ওআইসি এই সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ন্যায়সঙ্গত। বাংলাদেশে নানান সমস্যা থাকার পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের আশ্রয় দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এর ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বে একটি শক্তিশালী অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। শরণার্থী আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তুরস্ক, পাকিস্তান, লেবানন এবং ইরানের পর এখন বিশ্বে

বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাও এর ফলে বিঘ্নিত হয়েছে। কারণ অতীতে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে রোহিঙ্গারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠি তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করতে পারে। মানবতার প্রতি সম্মান দেখিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। তবে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বাংলাদেশের মধ্যে বিভাজন থাকা উচিত হবে না। কারণ এর সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা জড়িত। তাই এই সমস্যা সমাধানে জাতীয় পর্যায়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন।

মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে নির্বিচারে ধর্ষণ করার যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা গত একশত বছরের বিশ্বইতিহাসে তো দূরের কথা মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রাচীনকালের ইতিহাস ঘাঁটলেও এমন জঘন্য নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া করার জন্য সে দেশের সেনাবাহিনী যে কায়দায় ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং লোকজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কৌশল অবলম্বন করছে, তা দেখলে কুখ্যাত হালাকু খান কিংবা চেঙ্গিস খানও অনুশোচনীয় আত্মহত্যা করতেন। দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা, সামাজিক মাধ্যম এবং টেলিভিশনে যে সব স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, রোহিঙ্গা যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীদের বিবস্ত্র করে বিশেষ কায়দায় ভূমি থেকে কিছুটা উপরে উঁচিয়ে এক ধরনের বাঁশ বা কাঠের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়। তারপর ইচ্ছামতো অঙ্গচ্ছেদ, ধর্ষণ, নির্যাতন ইত্যাদি চালানোর পর হতভাগ্য নর-নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। সবচেয়ে নিষ্ঠুর অমানবিক এবং বর্বরতার ছবি তুলে সেনাসদস্যরা নিজেরাই তা প্রচার করে থাকে। ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত রোহিঙ্গারা দলে দলে দেশত্যাগ করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে অনেকটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, ঠিক যেন ঝড়ের গতিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মানবিকতা, উদারতা এবং সাহস নিয়ে এগিয়ে এসেছেন–তাতে নিশ্চয় রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী তৎপরতা ও কূটনৈতিক কৌশলের কারণে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ওআইসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন রোহিঙ্গাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তেমনি ভারত, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র মিয়ানমারের ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের মনোভাব

পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে এবং শুরু হয়েছে নানা মেরুকরণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী আলোচনার ক্ষেত্রে রয়েছে। ইউরোপীয় গণমাধ্যম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মাদার অব হিউম্যানিটি উপাধি দিয়েছে। আগামীর নোবেল শান্তি পুরস্কারের তালিকায় সংযুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

মানুষ মানুষের প্রতি এভাবে অত্যাচার করতে পারে, ভাবলেই শরীর শিউরে ওঠে। আজ ওদের অপরাধ ওরা মুসলমান। আজ বিশ্বের মানুষের উচিত রাজনীতিকে বাইরে রেখে এই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই অসহায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর যে নির্মম গণহত্যা চলছে তা ইতিহাসের সব বর্বরতাকে হার মানিয়েছে। বিশ্ববাসী এই গণহত্যার ধিক্কারের পরও মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী নিষ্ঠুরতা বন্ধ করেনি। তাই আমরা কূটনৈতিকভাবে শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছি। গণহত্যা বন্ধ না হলে আরাকান সমাধান করতে তার ব্যবস্থা বিশ্ববাসীকে নিতে হবে। বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ সব মুসলিম রাষ্ট্র ও মানবতাবাদী সংস্থার জন্য এটা লজ্জার। রাখাইনের ঘটনা দেরিতে হলেও বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়েছে। এ নৃশংসতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার জন্য বাংলাদেশ পদক্ষেপ নিতে রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বে নন্দিত হয়েছেন শেখ হাসিনা। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বর নির্যাতনে বাংলাদেশে আশ্রিতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ের মাধ্যমে শান্তির অনন্য দৃষ্টান্ত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বিশ্বশান্তির নেতা। এই নেতার পিতা ছিলেন ফাউন্ডার ফাদার অব বাংলাদেশ। আর শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে হয়েছেন মাদার অব হিউম্যানিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিসি বলেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যা, নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছে। মানবিকতার বিবেচনায় তাদের জায়গা দেওয়া অবশ্যই আমাদের কর্তব্য। তবে প্রায় এগার লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে চালাতে গিয়ে দেশের অর্থনীতিতে চাপ তৈরি হতে

পারে। এর সঙ্গে ঝুঁকির মুখে পড়বে দেশের পর্যটন খাত ও পরিবেশ। রোহিঙ্গা নির্যাতনের অবস্থার সঙ্গে ১৯৭১-এর মিল আছে। আমরা ৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নয় মাস এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয়, খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ সরকারও রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হলে আমরা দেশে ফিরে এসেছিলাম। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সে দেশ আগ্রহী নয়। তাই বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক মহলকে সঙ্গে নিয়ে এ সংকট সমাধানে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

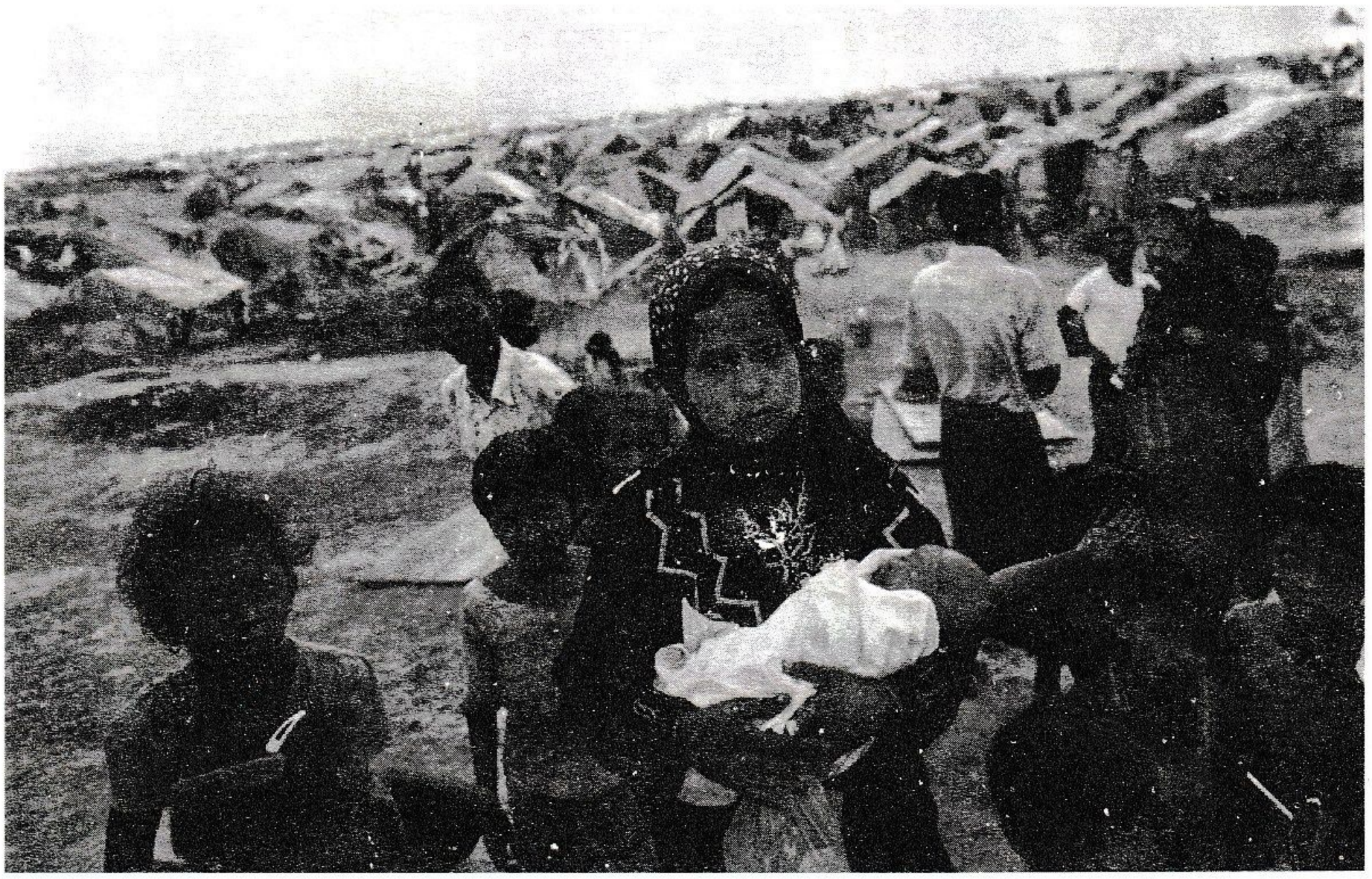

মিয়ানমার সরকার একটি জাতি-গোষ্ঠিকে নির্মূল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তাদের বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া দেশ হিসেবে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীর ভরণ-পোষণ চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আর রোহিঙ্গারা যে এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে তা দেশের পর্যটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তাই দ্রুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠনোর উদ্যোগ নিতে হবে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে। বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গারা যেন ফিরে যেতে না পারে সে জন্য মিয়ানমার

সীমান্তজুড়ে মাইন পুঁতে রেখেছে। একটা দেশ কতটা অমানবিক হলে এই ধরনের মানসিকতা পোষণ করতে পারে। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক। দুই দেশের সীমান্তে থাকা নদী পার হয়ে মানুষগুলো জীবন বাঁচাতে ছুটে এসেছে। তাই বাংলাদেশ মানবিকতার খাতিরে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলেও মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে। তাদের যেন শরণার্থী হিসেবে সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতে না হয় এজন্য বিশ্ব বিবেককে এগিয়ে আসতে হবে।

শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সে দেশের নেত্রী অং সান সু চি মানবিকতা বিবেকের কাঠগড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশের মানুষ সুচির অধিকার ফিরিয়ে দিতে রাজপথে আন্দোলন করেছিল। সু চি যেন নিজ দেশে মুক্ত স্বাধীন মানুষের মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারেন। অথচ তিনিই আজ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে দেশ থেকে তাড়িয়ে বিশ্বের কাছে তাদের শরণার্থী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মা হয়ে এই রোহিঙ্গা শিশুদের কষ্টে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নাই। অথচ আরেক রাষ্ট্রপ্রধান সু চি তার নিজ দেশের শিশুদের এই অসহায় অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশ সরকার মানবিকতা বিবেচনায় সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু দেশ এখন অবকাঠমো, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এ সময় এত বড় ধাক্কা সামলানো দেশটির জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কূটনৈতিক দিক থেকে কাজে লাগিয়ে এই মানুষগুলোর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব। এই সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশে তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাখাইনের পরিস্থিতি নিয়ে মিয়ানমারের সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টির উসকানি রোধ করতে বাংলাদেশ সরকার সামরিক নয়, কূটনৈতিক তৎপরতায় বিশ্বাসী। রোহিঙ্গাদের সমস্যাটি জাতিগত, কোনো ধর্মীয় সমস্যা নয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদে ফেরত পাঠানো এবং মর্যাদার সঙ্গে তাদের নিজ দেশে পুনর্বাসনই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করার জন্য দেশটিতে শান্তি নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে সরকারের অবস্থান

তুলে ধরতেই এই সব কথা বলছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দ্বিপক্ষীয় কূটনীতির সঙ্গে আঞ্চলিক ও বন্ধুপক্ষীয় তথা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমাধানের পথেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাশে চাচ্ছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। যুদ্ধকে আমরা সমাধান মনে করি না। কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী–প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে উদ্ভূত উদ্বাস্তু সমস্যাকে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। অন্যের সমস্যা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমরা বর্ডার বন্ধ করে দিয়ে এ সমস্যা এড়াতে পারতাম। কিন্তু মানবতা ও মনুষ্যত্বকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে আমরা সমস্যাটা গ্রহণ করেছি। কারণ মানবিক সংকট নিয়ে শেখ হাসিনার সরকার রাজনীতি করে না।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের প্রতি দ্রুত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মানবতা এবং উদারতার পরিচয় দিয়েছে। রোহিঙ্গা বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সাড়া দিয়েছে। তারাও রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসছে। তাই বিশ্ব যদি এই সংকটে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায় তা হলে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নিধনে যে বর্বরতা দেখিয়েছে তা বিশ্ববিবেককে হতবাক করেছে। সাধারণ মানুষের ওপর এ ধরনের নৃশংসতা সত্যিই মেনে নেওয়া যায় না। রোহিঙ্গারা নদী-কাদা-পানি মাড়িয়ে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে এসেছে। এই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ সরকার মানবিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। রোহিঙ্গাদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করেছে। অনেক দেশ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা এদেশে এসে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি দেখে আরও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। তাই সবাই যদি হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে এই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ভরণপোষণ চালাতে খুব একটা চাপে পড়তে হবে না। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক, মিয়ানমার এই জাতি-গোষ্ঠির ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। তাই জীবন বাঁচাতে তারা বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। অবশ্যই সামরিক মিয়ানমারকে তাদের নিজেদের নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। বিষয়টা যেন

সাময়িক থাকে স্থায়ীরূপে পরিণত না হয়, এজন্য আন্তর্জাতিক মহলে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে বাংলাদেশ।

সারা বিশ্বে ফার্স্ট লেডিদের এমিনি এরদোগানের চিঠি :

মিয়ানমারে সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের স্ত্রী ও ফার্স্ট লেডিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেছেন তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনি এরদোগান। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিবির ঘুরে যাওয়া এমিনি এরদোগান চিঠিতে লিখেছেন–আমরা যারা বিশ্বনেতাদের স্ত্রী বা ফার্স্ট লেডি, তারা সত্যিই অনেক মানবিক হতে পারি। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা অসহায় রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারি, যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের মানবিক সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন- একজন মা, একজন নারী ও একজন মানুষ হিসেবে আমি মনে করি, এমন এক মানবিক পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে সবাই মিলেমিশে থাকবে, যেখানে থাকবে না কোনো জাতিগত কিংবা ধর্মীয় বৈষম্য। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের কথা স্মরণ করে এরদোগানের স্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়ে আমি রোহিঙ্গা নারীদের কথা শুনেছি। ওই নারীরা বলেছে তাদের চোখের সামনে স্বামী-সন্তানকে মিয়ানমার সেনারা হত্যা করেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওই সব করুণ কাহিনি আমাকে অবাক করেছে, নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে।

সু চির কানাডার নাগরিকত্ব বাতিলের দাবি : রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধে পদক্ষেপ না নেওয়ায় মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির সম্মানসূচক নাগরিক বাতিলের দাবি উঠেছে। দেশটির রাজনীতিবিদ, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী ছাড়াও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডীয় নাগরিকরা বিভিন্ন বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী জাষ্টিন ট্রু-ডোর কাছে এ দাবি তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া ইন্টারনেটে এ বিষয়ে একটি পিটিশন ক্যাম্পেইন চলছে, সেখানে পাঁচ দিনে প্রায় নয় হাজার মানুষ সই করেছে। অবশ্য টরেন্টোতে কয়েকটি সংগঠন আয়োজিত এমন এক সমাবেশে অংশ নেন খোদ কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রিল্যান্ড। রাখাইনে চলমান সেনা অভিযান সম্পর্কে ফ্রিল্যান্ড বলেন, মিয়ানমার সরকারের অভিযান মূলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। কানাডার সরকার এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে।

মিয়ানমারকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও দেশটির সেনাবাহিনীর ওপর কঠোর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। এ জন্য নিরাপত্তা পরিষদে উপযুক্ত আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে সংস্থাটি, তবে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে দ্রুত মিয়ানমারের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও আহ্বান জানিয়েছে তারা। রাখাইনের রোহিঙ্গাদের "জাতিগত নিধন" রুখতে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মিয়ানমারের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটি। মিয়ানমারের সামরিক কর্মকর্তারা যদি অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে পড়ে তবেই তারা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানে সাড়া দেবে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মিয়ানমারকে ঔপনিবেশিক "বার্মা" হিসেবে পরিচিত করেছে। এতে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গাদের উপর ভয়াবহ সহিংস ভূমিকার কারণে বিশ্বব্যাপী নিন্দিত হচ্ছে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী। দেশটির সেনাবাহিনী ওপর এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা দরকার যেন কোনোভাবেই সে দেশের জেনারেলরা তা উপেক্ষা করতে না পারে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং এই ইস্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর উচিত মিয়ানমারের ওপর কঠোর অবরোধ ও অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাতে তাদের জাতিগত নিধন সংক্রান্ত প্রচারণা ও কার্যক্রম বন্ধ করা যায়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রথমত, নিরাপত্তা পরিষদের একটি উন্মুক্ত আলোচনায় বসা উচিত। রাখাইনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেসকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। আলোচনায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যারা এরকম নৃশংস অপরাধ করেছে তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে শাস্তির বিষয় নিশ্চিত করা উচিত পরিষদের। রোহিঙ্গা ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। মিয়ানমারে তাদের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত এবং অপরাধী নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা উচিত। সামরিক সহায়তা বন্ধ করা, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং মিয়ানমারে পরিচালিত ব্যবসাগুলোর আর্থিক লেনদেনও বন্ধ করা উচিত। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা জেনারেল মিস অংল্লাইয়াংকে যুক্তরাষ্ট্রের স্পেশালি ডেজিগণ নেচেড ন্যাশনাল তালিকায়

অন্তর্ভুক্ত করা উচিত মার্কিন সরকারের। এই তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ করতে পারেন না। মার্কিন কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করতে পারেন না এবং যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সম্পদও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ইউরোপীয় ও এর সদস্য দেশগুলোরও এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত।

মিয়ানমার সামরিক বাহিনী শুরু করেছে রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞ। পাহাড়, জঙ্গল ও আরসার নিজস্ব পোশাক না থাকায় সামরিক বাহিনী অনেক অসহায় আর নিরপরাধ রোহিঙ্গার ওপর আরাকান বিদ্রোহী জঙ্গি সন্দেহে সাড়াশী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আকাশপথেও গান পাউডার ছিটানো হচ্ছে, যার দাবানলে জ্বলছে রাখাইনের রোহিঙ্গারা। বসতবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ষণ, লুটপাটের সঙ্গে গণহত্যায় মেতে উঠেছে সামরিক বাহিনী। মেশিনগান আর বন্দুকের ছোড়া গুলিতে অসংখ্য রোহিঙ্গা হয় নিহত হচ্ছে, নতুবা ক্ষতবিক্ষত শরীরে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে সাগরে। রোহিঙ্গাদের জাতিগত নির্মূলে এই প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয়। গত ষাটের দশক থেকেই এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কখনো কখনো তা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। মিয়ানমারে এক সময় তাদের ভোটাধিকার ছিল। সংসদ এমন কি সরকারের মন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছে রোহিঙ্গারা। সপ্তম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি মিয়ানমার আসা শুরু করেছিল। এরা মূলত ছিল আরবের নাবিক ব্যবসায়ী ও যাযাবর। অথচ দশ শতাব্দী থেকে আরাকানে তথা বর্তমান রাখাইনে প্রবেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়ে এদের নেতৃবৃন্দ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করে রাখাইন প্রদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আটচল্লিশে ব্রিটিশের কাছ থেকে মিয়ানমার স্বাধীনতা লাভ করলে রোহিঙ্গারা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে ধীরে ধীরে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ষাটের দশকে সামরিক জান্তা নেউইন ক্ষমতা দখল করে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী দমনের নামে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নিপীড়ন নির্যাতন শুরু করেন। সেই থেকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী চলে আসছে হত্যা-নিপীড়ন বিতাড়ন। ভোটাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সব সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি দেশটি ১৩০টি জাতিগোষ্ঠিকে সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেয়নি। দীর্ঘদিন চলে আসা এ সমস্যার সমাধানে মানুষ

আশার আলো দেখেছিল যখন শান্তিতে নোবেল জয়ী অংসান সু চি রাষ্ট্রটির "ডিক্যান্টো" সরকার প্রধান কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। কিন্তু দেশটি বহুদিন পর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ফিরে এসেছে বলে দাবি করা হলেও আসলে দেশটির সেনাবাহিনীর ওপর কথা বলার মতো সাহস ও যোগ্যতা এখনো কোনো রাজনৈতিক দলের হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। গণতন্ত্রের নামে সেখানে মূলত সেনাতন্ত্রই কায়েম রয়েছে। সু চি নিজে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে শেষাবধি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে একটি 'প্যাচ আপ'-এর মাধ্যমে ক্ষমতা পেলেও দেশটির সংখ্যাগুরু বার্মিজদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট হারাতে নারাজ। ফলে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে তার মাথাব্যথা সামান্যই। অথচ এ সমস্যার সমাধান মূলত ওই দেশের সরকার সেনাবাহিনী ও সুশীল সমাজের ওপরই নির্ভর করছে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল নেউইন রোহিঙ্গাদের দমন করতে অপারেশন কিং ড্রাগন পরিচালনা করেন।

মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা উথাটং ভারত সফরে গিয়ে অভিযোগ করেছেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সঙ্গে পাকিস্তানের উগ্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই তৈয়বার যোগাযোগ আছে এবং বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় তারা একটি শক্তিশালী ঘাঁটি তৈরিতে সমর্থ হয়েছে। যদি এটি হয়ে থাকে তবে তা আমাদের জন্যও সত্যিই বিপদের কথা। রোহিঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহীরা যদি মিয়ানমার থেকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে রোহিঙ্গা সমস্যাটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। নিরপরাধ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়, ত্রাণ সহায়তাসহ যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতে যেমন কুণ্ঠিত নয় সরকার, তেমনি সন্ত্রাসীরা ঢুকে পড়ছে কিনা সে বিষয়েও সরকার যথেষ্ট সতর্ক। বিভিন্ন সময় সামরিক নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে আসা ৪ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি এ দেশে বসবাস করছে। আর এবারের সামরিক অভিযানে প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা এ দেশে প্রবেশ করেছে। এত বিপুল জনসংখ্যাকে দীর্ঘদিন লালনপালন করা এ দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই অনুপ্রবেশ দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। এর পরও ঝুঁকি নিয়ে হলেও মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সরকার। বঙ্গবন্ধু-কন্যা নিজে

ছুটে গেছেন শরণার্থী শিবিরে তাদের সান্ত্বনা ও সহযোগিতার আশ্বাস দিতে। ইতিমধ্যে কক্সবাজারের উখিয়ায় বালুখালীর পাহাড়সহ আশেপাশের প্রায় ৩ হাজার একর বনভূমিতে গড়ে তুলেছেন রোহিঙ্গাদের জন্য নতুন আশ্রয়শিবির, দেওয়া হচ্ছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা ও চিকিৎসা সুবিধা। এ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে আশ্রয়শিবিরে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিরসনের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের জন্য পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। শুধু বাংলাদেশ নয় রোহিঙ্গা সমস্যায় আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলো বেশ সরব। বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক অঙ্গনও বেশ উদ্বিগ্ন। যুক্তরাজ্য-জার্মানসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ এ সংকট সমাধানে জোরালোভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে। ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান জায়েদ রাদ আল হোসাইন মিয়ানমারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, রোহিঙ্গাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে মিয়ানমার। তিনি একে জাতি নির্মূল বলে আখ্যায়িত করেছেন। জাতিসংঘ ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের তত্ত্বাবধানে একটি কমিশন মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের সমস্যা সমাধানে সুপারিশমালা দিয়েছে। কিন্তু ভারত ও চীনের মতো দেশগুলো মিয়ানমার সরকারকে যেভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক মিয়ানমার সফরে তিনি রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে নিরব ছিলেন। ১৫ বছর ধরে ভারত কখনো সরকারিভাবে রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করেননি। আমেরিকা এ বিষয়ে দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করে আসছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবিক দিকের কথা বলছে, আবার অস্ত্র ব্যবসার কারণে মিয়ানমারকে সমানে মদদ দিয়ে চলেছে। চীনও মিয়ানমার সরকারকে সমর্থন করছে। এ ইস্যুতে রাশিয়ার সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা করছে মিয়ানমার। এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এ সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে সামনে এগোচ্ছে। কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশ ও জোটকে অনুরোধ জানাচ্ছে, যাতে সন্তোষজনক সাড়াও মিলছে। নিউইয়র্কে

জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনে গুরুত্ব পাচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুটি। নিরাপত্তা পরিষদেও এ নিয়ে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ সংকটের একটা স্থায়ী সমাধান চায়। সংগতকারণেই এ দেশে অবস্থানরত সব রোহিঙ্গাকে নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে দিতে চায়। এ সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত দায়িত্ব বাংলাদেশের হাতে নেই, এ দায়িত্ব মিয়ানমারের। নাগরিকের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই। এ জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য মিয়ানমারের ওপর প্রবল চাপ প্রয়োগ করতে হবে। মিয়ানমার যদি এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দিকে যায় তবে আশা করা যায়, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে। কিন্তু যদি তারা তা না করে তবে প্রয়োজনে কর্মপন্থায় সাহসী পরিবর্তন এনে অবরোধ, আরোপ, সামরিক জোট গঠনসহ বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। তবে নমনীয়তার মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধানই সবার কাম্য।

মিয়ানমারে রাখাইন রাজ্য থেকে বিতাড়িত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১১ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গার প্রতি কমনওয়েলথ সদস্য দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা পূর্ণ সংহতি জ্ঞাপন করেছেন। বাস্তুচ্যুত এ জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। রাখাইন রাজ্য থেকে বিতাড়িত বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া এ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির প্রতি কমনওয়েলথ সদস্য দেশের সরকার প্রধানদের পক্ষ থেকে পূর্ণ সংহতি জানানো হয়েছে। অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়া বাস্তুচ্যুত এ জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দেওয়ায় প্রশংসা করার পাশাপাশি কমনওয়েলথ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা মিয়ানমারের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করা ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার আহ্বান করেছেন। উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে মিয়ানমারের চুক্তির কথা উল্লেখ করে কমনওয়েলথ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবর্তন শুরু করার কথাও বলেছেন। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার সমাজে সমান সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথাও বলেছেন। কমনওয়েলথ সম্মেলনের সাইড লাইন একাধিক কর্ম অধিবেশনেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন এবং রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে

মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির ব্যাপারে কমনওয়েলথ দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোসহ বেশ কয়েকটি দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করে বাংলাদেশের পাশে থাকার ব্যাপারে তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একান্ত বৈঠকেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশে আশ্রয়কারী রোহিঙ্গাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও পথ্য দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করে এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চেয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সুপারিশ অনুসারে ইস্যুকৃত বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্ড বা রেশন কার্ড দেখিয়ে সরকারি সেবাকেন্দ্র বা হাসপাতাল থেকে ফ্রি সেবা নিতে পারবে রোহিঙ্গারা। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য সেবাপ্রার্থীদের পৃথকভাবে নিবন্ধন করবে সরকারি সেবাকেন্দ্র ও হাসপাতাল। বর্তমানে রোহিঙ্গা শিবিরের পাশে হাসপাতাল নির্মাণ করে সেখানেই তাদের চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পের বাইরে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পায় না তারা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী নির্দেশিত রোহিঙ্গারা সরকারি হাসপাতালে সেবাকেন্দ্রে ভর্তি হয়েও চিকিৎসা সেবা নিতে পারবে। এ জন্য তাদের কাছ

থেকে কোনো ফি নেওয়া হবে না। নিবন্ধনকৃত সেবাপ্রার্থীদের সরকারি সেবাকেন্দ্র, হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে রুগী রেজিস্ট্রেশন ফি, ভর্তি ফি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত ফি এবং পরিবহনের জন্য সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া মওকুফ করা হবে। রোহিঙ্গাদের বিনামূল্যে পথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি হাসপাতালের অনুকূলে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দেরও সুপারিশ করেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা, জাপান ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেল এজেন্সি জোক্স টার্টিম ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর রিহেবিলিটেশন (টিকা) জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, রেডক্রসসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার সমন্বয়ে বর্তমানে রোহিঙ্গা শিবিরে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা চলছে। এ ছাড়া অস্থায়ীভাবে কয়েকটি পশ্চিমা দেশের মেডিকেল টিমও রোহিঙ্গা শিবিরে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে। মিয়ানমারের রাখাইনে নির্যাতনের মুখে পালিয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের অনেকেই অসুস্থ। উদরাময় ও কলেরার ঝুঁকি

রয়েছে বলে সেখানে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে রোহিঙ্গারা।

রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে কম্বোডিয়ার সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এ সংকট। রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। এ সংকটের স্থায়ী সমাধানে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী লুন সেনকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন তিনি। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে সহস্রাধিক নারী ও শিশু নিখোঁজের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী সেখানে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে মাইকিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ার পর

নিখোঁজের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। শিশু ও নারীপাচার রুখতে সেখানে বিভিন্ন পয়েন্টে ২৭টি তল্লাশি চৌকি বসিয়েছেন। পুলিশ ও বিজিবিকে দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে দালাল চক্রের প্রতারণার অভিযোগে ২৫০ জনকে সাজা দিয়েছেন। সেখানে বর্তমানে নারী ও শিশুপাচার বন্ধে পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। উখিয়ার কুতুবপালাং টিভি টাওয়ার পাহাড়, বালুখালী, মাইনার ঘোনা, তাজনিরমার খোলা, হাকিমপাড়া, খাইংখালী, তেল খোলাসহ অস্থায়ী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নারী-শিশুপাচার ঘাঁটি ছিল। সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে পাচারকারী চক্রের অনেক সদস্যই ত্রাণ দেওয়ার নামে দামি দামি গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পগুলোয় আসত। সামান্য কিছু ত্রাণ বিতরণের নামে তারা নারী ও শিশু টার্গেট করত। তারা সঙ্গে নিয়ে আসত শাড়ি-গহনাসহ শিশুদের পোশাক। সুবিধাজনক কোনো স্থানে টার্গেট করা নারী ও শিশুকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ওই সব পোশাক পরাত। এক পর্যায়ে নিজের গাড়ি কিংবা মাইক্রো করে তাদের নিয়ে যেত। এইগুলো বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদক্ষেপে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর কেউ সেখানে ত্রাণ দিতে পারে না। কোনো প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় কাউকে যেতে দেওয়া হয় না।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইন মন্ত্রালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশিদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কেননা ফরেইনার্স অ্যাক্ট অনুসারে বিদেশিরা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে রোহিঙ্গাদের বিয়ে করা যাবে না। বাংলাদেশী ছেলেদের সঙ্গে রোহিঙ্গা মেয়েদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা অনেক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং কোনো কোনো নিকাহ রেজিস্ট্রি বিশেষ এলাকা নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়ে বাংলাদেশি নাগরিক কিনা বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সঠিক সব নিকাহ রেজিস্টারকে নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে গাফলতি হলে দায়ী নিকাহ রেজিস্টারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ আজ আশ্রয় নিয়েছে। এখানে আসতে তারা বাধ্য হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ তাদের উপর অমানবিক অত্যাচারের যে সব চিত্র আমরা দেখলাম তা নিন্দা করার ভাষা নেই। রোহিঙ্গারা যে মিয়ানমারেরই নাগরিক এটা সবাই জানে। ১৯৫৪ সালে বার্মা অর্থাৎ বর্তমানে মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী উ-নু রোহিঙ্গাদের, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি যেমন কাটিন, কাইয়া সুন, রাখাইন, সান এ ধরনের আরও বিভিন্ন প্রায় ১৪৫টির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে। তাদের সবার সঙ্গেই বসবাস করার অধিকার এই রোহিঙ্গাদের আছে। সে কথা তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং রেডিওতে তা প্রচার করা হয়েছিল। কাজেই যে অধিকার তারা একবার দিয়েছিল এবং তাদের ভোটের অধিকার ছিল। ১৯৭৪ সালে এই বার্মা, বর্তমান মিয়ানমারের মিলিটারি জান্তা এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৭৮ সালে রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন শুরু করেছিল। এর পর তারা ১৯৮২ সালে যে সিটিজেন আইন করে, সে আইন একটা চার স্তর বিশিষ্ট সিটিজেনশিপ প্রয়োগ করে। এটা করার উদ্দেশ্যই ছিল এদের অধিকারটা কেড়ে নেওয়া। ২০১৫ সালে এসে এই রোহিঙ্গাদের সমস্ত ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়। এভাবে একটা জাতির প্রতি এ ধরনের আচরণ মিয়ানমার সরকার কেন করছে তা সত্যিই দুঃখজনক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

১৬ কোটি মানুষকে আমরা খাবার দিই, তার সঙ্গে আরও এ রকম ১১ লক্ষ মানুষকে খাবার দেওয়ার মতো শক্তি আছে। আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করে যাব। এর পরও যারা সাহায্য দেবেন আমাদের কমিটি করা হয়েছে সেই কমিটির মাধ্যমে সাহায্য দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তার বিশেষ তহবিল থেকে এবং কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কেউ সাহায্য-সহযোগিতা করতে চান তবে করতে পারেন। তিনি আরো বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না–আমরা শুধু মানবতার খাতিরেই রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এদের সহযোগিতা করে যাচ্ছি। কিন্তু এটা সাময়িক ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অবশ্যই মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের নিজের ভূমিতে ফেরত নিতে হবে মিয়ানমারকেই। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয়, জাতিগত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর অব্যাহত নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ, তাদের নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে পুশইন করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মিয়ানমার সরকারের ওপর জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মহলে জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে পররাষ্ট্রনীতি দিয়েছেন সেই নীতিমালা অনুসরণ করেই আমরা প্রত্যেক দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। কারও সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক আমরা চাই না। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়েই থাকতে চাই।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কান্নাকণ্ঠে বলেছেন–১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঠিক যেভাবে, যে কায়দায় আমাদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল, অগ্নিসংযোগ করেছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, মানুষকে হত্যা করেছে, এবং ছোট শিশুদের হত্যা করেছে, ঠিক সেই ঘটনা যেন আবার চোখের সামনে ভেসে আসছে। রোহিঙ্গারা জীবনের ভয়ে পালিয়ে আসছে। আমাদের জন্য এটা কঠিন যে, এতগুলো মানুষকে এখানে রাখা, তাদের আশ্রয় দেওয়া। কিন্তু এরা তো মানবজাতি। আমরা তো ফেলে দিতে পারি না। কারণ আমরা ভুক্তভোগী। আমরা জানি। আমরাও তো রিফিউজি

ছিলাম। ৭৫-এ যখন আমার মা, বাবা, ভাই-বোন সবাইকে হত্যা করল। আমরা তো দেশে আসতে পারিনি। সে যন্ত্রণা আমি, আমার ছোট বোন রেহানা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝি। তাই আমরা এদের আশ্রয় দিয়েছি মানবিক কারণে।

প্রধানমন্ত্রী যখন দেখলেন যে ভাবে রোহিঙ্গাদের হত্যা করছে এবং তাদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করছে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করছে, মুসলমানরা রিফিউজি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে-ওখানে, যখন দেখলেন আরনানের লাশ, নাফ নদে শিশুদের লাশ–ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ওআইসির সেক্রেটারী জেনারেলকে বলেছেন বিশ্বের মুসলমানদের উপর থেকে নির্যাতন বন্ধ করতে।

রোহিঙ্গা ফেরতের ব্যাপারে শেখ হাসিনা বারবার প্রতিবাদ করেছেন এবং বিশেষ করে ৭৮ সালে একদফা রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। এরপর ১৯৮১, ৮২ সালে, তারপর ৯১-৯২ সালে তখন মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের একটা সমঝোতা হয়েছিল, যার ফলে প্রায় আড়াই লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের নিজের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছিল। ১৯৭৮ সালে যারা এসেছিল তারাও সবাই চলে গেছে। ১৯৮১, ৮২ সালে যারা এসেছিল তাদেরও ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯১-৯২ সালে যারা এসেছিল তাদেরও ফেরত দেওয়া হলো। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু রোহিঙ্গা থেকে গেল। সেই সময় রেজিস্টার্ড প্রায়

চার লাখ এবং রেজিস্টার্ড বেশ কিছু রোহিঙ্গা থেকে গিয়েছিল। তাদের আর ফেরত নেওয়া হলো না। সেখানেই একটা বাধা পড়ল।

শেখ হাসিনা বারবার এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতবার মিয়ানমার গেছেন ততবার মিলিটারি শাসকদের অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন এরা আপনাদেরই নাগরিক। আপনারা তাদের ফেরত নিয়ে যান, এরা মানবেতর জীবনযাপন করছে। এরপর গণতন্ত্র ফিরে এলো। অং সান সু চি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তার সঙ্গে শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময় দেখা করেছেন। তখনই রোহিঙ্গাদের ফেরতের ব্যাপারে আলাপ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের প্রতি অমানবিক আচরণ ও অত্যাচার বন্ধ করে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ছোট বোন শেখ রেহেনাকে নিয়ে উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনী শুনে প্রধানমন্ত্রী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং দুর্গত নারী ও শিশুদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেন। প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমার সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার নীতিতে বিশ্বাসী।

তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ মিয়ানমারের শরণার্থীদের আশ্রয় দিলেও এদেশের ভূমি ব্যবহার

করে কোন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা বরদাস্ত করা হবে না। মিয়ানমার সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন, তারা যেন নিরীহ মানুষের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে। তারা যেন প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে যা যা সাহায্য করা দরকার, আমরা তা করব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মানুষদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মানুষ উপায় না পেয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। তাই আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তা দিয়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য করা হচ্ছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের খাদ্য আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, মিয়ানমারে যেভাবে মানুষ হত্যা হচ্ছে তাতে কি তাদের বিবেককে নাড়া দেয় না? একজনের ভুলে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরহারা হচ্ছে। আমরা ১৭ কোটি মানুষের দেশ। এ দেশের মানুষের খাদ্য, নিরাপত্তা যেহেতু নিশ্চিত করা হয়েছে সেহেতু আরও ১১ লক্ষ মানুষকে আমরা খেতে দিতে পারব।

রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকারান্তরে দেশের ১৭ কোটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পেয়েছে। মিয়ানমারের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের কাছেও প্রত্যাশিত। কিন্তু গুটিকয়েক জঙ্গি সন্ত্রাসীর

অপরাধের দায় নিরীহ মানুষের ওপর চাপানোর যে ভ্রান্তিতে সে দেশের সরকার ভুগছে তা দুর্ভাগ্যজনক। মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই এ ভুল পথ থেকে সরে আসা উচিত।

সাম্প্রতিক রোহিঙ্গাদের আর্তচিৎকার, অসহয়াত্ব, অত্যাচার, বিতাড়িত এবং গ্রামের পর গ্রাম পোড়ানো অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। রোহিঙ্গাদের জন্য ভারত তার সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা। এই রোহিঙ্গাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার সাহসী উদ্যোগ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়েছেন। বিষয়টি বিশ্বের প্রশংসার দাবিদার এবং তা বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার সব সময় রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা করেছে। ২০১২ সালে মিয়ানমারে জাতিগত দাঙ্গার সময়েও বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে মিয়ানমার শিক্ষা নিতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অং সান সু চিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সম্ভাব্য সব কিছুই করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বর্তমানে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে মানবতার জননী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশ্বনন্দিত পদক্ষেপসমূহকে সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাঙ্ক (বিএবি)র সদস্য ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে থেকে ৩১টি ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১৪০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিএবির আরো চারটি সদস্য ব্যাঙ্ক প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে ২০ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

তিনি মনে করেন রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়াটা বাংলাদেশের জন্য বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ সমর্থন দিয়েছে, সাধুবাদ

জানিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাজনৈতিক কূটনীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে সম্মতি পত্র স্বাক্ষর হওয়াকে বিরাট সাফল্য মনে করেন। দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে অন্তত একটা সমঝোতা করতে পেরে অন্তত এই মিয়ানমারের নাগরিকদের ফেরত পাঠাতে পারবে। মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপের কোনো সন্দেহ নেই তার পরও যেহেতু প্রতিবেশী দেশ, এই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই একটা ভালো সম্ভাব রেখে এই সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছে তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফেরত পাঠাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশি কূটনীতিকদের সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন ডিপ্লোমেসিতে আগে পলিটিক্যাল বিষয়টি গুরুত্ব পেত। তখন ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি গুরুত্ব পাচ্ছে।

বাংলাদেশে শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করা রোহিঙ্গাদের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার মহিলা বর্তমানে গর্ভবতী। এদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ায় আদেশ দিয়েছেন তিনি এ ছাড়াও বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে এক হাজার ৬৭টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। অন্যদিকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রসব-পূর্ববর্তী সেবার আওতায় আছে ২ হাজার ৪৯৯ জন এবং এসব পরবর্তী সেবার আওতায় আছেন ৩১২০ জন। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করা রোহিঙ্গা

শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনায় লক্ষে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নিপীড়নের মুখে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে আসার ঘটনা দেশে দেশে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। বিক্ষোভ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা, ভারতের কলকাতা ঢাকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে। নিন্দা ও উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে বলে উল্লেখ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। মালয়েশিয়া শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে। সব মিলিয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সরকার ও সেনাবাহিনীর নারকীয় ভূমিকায় বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র হিদার নোয়াট মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর সেনাবাহিনীর হামলার নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠি বলেছে জাতিসংঘ। যুগ যুগ ধরে মিয়ানমারে বসবাস করার পর তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশটিতে গণহত্যাসহ অব্যাহতভাবে নানা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওআইসি'র ৪৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভার উদ্বোধনকালে বিপন্ন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নিপীড়িত মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়ে গেছেন কাজেই মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যখন জাতিগত নির্মূলের মুখোমুখি, ওআইসি তখন নিশ্চুপ থাকতে পারে না। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে ওআইসিকে অবশ্যই নেপিদোর ওপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি দেশ। সিমিত আয়তনের এ দেশটিতে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের বসবাস। এ ছাড়া বাংলাদেশে সব সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে, হাওরে আগাম বন্যা এবং দেশজুড়ে অতিবৃষ্টি ও বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। নিজেদের দুঃসময়েও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের বিপদাপন্ন রোহিঙ্গাদের প্রতি মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নিপীড়িত মানবতার জন্য আমরা আমাদের চিত্ত ও সীমান্ত দুই-ই উন্মুক্ত করে

দিয়েছি। মিয়ানমারের প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলা এবং সব ধরনের বিভাজন দূর করার এ প্রস্তাবে ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় আহ্বান জানিয়েছেন। যা মুসলিম বিশ্বকে যুগের দাবি পূরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠির প্রতি যে অপরাধ ঘটেছে তা এককথায় জাতিহত্যা। এই গণহত্যার সকল দায়ভার একা সেনাবাহিনীর নয়। মিয়ানমার সরকারের, সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের, এমন কি সে দেশের মানুষেরও। মানবাধিকার নেত্রী হিসেবে প্রশংসিত অং সান সু চিও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। দায়িত্ব এড়াতে পারে না আন্তর্জাতিক গোষ্ঠিও। কোনো ভুল নাই সেনাবাহিনীর সদস্যদের বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে নিরীহ মানুষের বুক। আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে গ্রাম কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেই বন্দুক এসেছে বিদেশ থেকে। এই সব বিদেশির কেউ কেউ নিজেদের পরাশক্তি বলে সেই যুক্তিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তারা ভেটো প্রদানের ক্ষমতাও রাখে। এদেরই কাঁধে বন্দুক রেখে জাতি হত্যায় মেতেছে মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী। তারা যতই কথা বলুক না কেন, নিজেদের হাতে লেগে থাকা রক্তের দাগ এই পরাশক্তিধর নেতারা কিছুতেই মুছতে পারবে না। নিহত ও আশ্রয়চ্যুত প্রতিটি রোহিঙ্গার অভিশাপ তাদেরই বহন করতে হবে। বিশ্বের কারো কানে যখন এই সকল উদ্বাস্তু শিশুদের কান্নার শব্দধ্বনি কানে বাজে না সেই সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কানে বেজে উঠল কান্নার শব্দ, রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ত্রান দাই কুয়াং। রোহিঙ্গা সংকট এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। এই রোহিঙ্গা সংকটের শান্তি পূর্ণ সমাধানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিয়েতনামের সমর্থন চেয়েছেন। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি দাই কুয়াং কার্যকর ও স্থায়ী সমাধানের সমর্থন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভিয়েতনাম আমাদের কাছের প্রতিবেশী। রোহিঙ্গাদের শান্তি ও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট। শেখ হাসিনা বলেছেন ষাটের দশকে শিক্ষাজীবনে আমি নিজে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ র‍্যালিতে অংশ নিয়েছি। আমি আশা করি ভিয়েতনাম রোহিঙ্গা সমস্যায় আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূতকে বলেছেন রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরে কর্মরত বিদেশি ত্রাণকর্মীদের ভিসা সমস্যা সমাধান করা হবে। কানাডার মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার হোটেল কক্ষে দেখা করতে গেলে শেখ হাসিনা বলেন, টুরিস্ট ভিসায় বাংলাদেশে এসে অনেক বিদেশি নাগকির রোহিঙ্গা শিবিরে কাজ করছে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান পত্নী এসেছিলেন বাংলাদেশে, কান্নাকাটি করেছেন শরণার্থীদের কাছে গিয়ে। দেশে দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে কারণ সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর মিয়ানমারের সামরিক জান্তা গণহত্যা চালিয়েছে, ধর্ষণে মত্ত হয়েছে। ভিটেমাটি ছাড়া করছে। রোহিঙ্গাদের আজ কোনো আবাসভূমি নেই, মিয়ানমার শাসকরা তাদের ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব হরণ করেছে। বঙ্গবন্ধুর-কন্যা শেখ হাসিনা ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই অভিমত শুধু বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নয় গোটা দেশের মানুষের নয়, বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরও। এ নিয়ে রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই।

রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মানবতার দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশে ১১ লক্ষের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এ সংকট নিরসনে বাংলাদেশ বিশেষ করে মিয়ানমারের সীমান্ত সংলগ্ন প্রতিবেশী পাঁচ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে অনান্য আপদ ছাড়াও আশ্রিত

রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা ও সেবার কাজে বাংলাদেশের ২৮ হাজারের মতো লোকবল দিনরাত কাজ করছে। সরকার বাংলাদেশে প্রবেশ করা মিয়ানমারের নাগরিকদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন ও পরিচয় দিয়েছে, যাতে তাদের প্রত্যাবাসন কাজ সহজ হয়। ক্ষেত্রপালসিং রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার এ ক্ষেত্রে বিশাল এক কাজ করেছে। সেই কাজটি হচ্ছে টিকাদান ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

দরিদ্র, অসহায়, বিশেষত মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সেবায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মেডেল অব ডিসটিংকশনে ভূষিত করেছে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল। ঢাকায় সফররত লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট নরেশ আগরওয়াল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পদকে ভূষিত করেন।

পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠির নাম রোহিঙ্গা। এরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী। রাসুল (সাঃ)-এর বেঁচে থাকার সময় বিশিষ্ট সাহাবি আবু ওয়াক্কাস ইবনে ওয়াইব (রাঃ)-এর হাত ধরে ইসলামের আলো জ্বলে আজকের আরাকানে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ)-এর শাসনামলে আরাকানের শাসকদের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের যোগাযোগের বিষয়টিও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। বর্তমানে মিয়ানমারের রোহিং আরাকানের পুরনো নাম। এলাকায় বসবাসকারীরা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। রোহিঙ্গা শব্দের অর্থ হচ্ছে নৌকার মানুষ। যারা সমুদ্রজলে নৌকা ভাসিয়ে মৎস্য সম্পদ আহরণ করে জীবিকা অর্জন করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, আরবি শব্দ রহম মানে দয়া করা। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবের বাণিজ্য জাহাজ রামব্রি দ্বীপের তীরে এক সংঘর্ষে ভেঙে পড়ে। তখন তারা রহম রহম বলে আল্লাহর কাছে দয়া ভিক্ষা করে। আল্লাহতায়ালা তাদের বাঁচিয়ে দেন। সে থেকেই তারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহর দরবারে দু' হাত তুলে এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজে এই রোহিঙ্গাদের জন্য দোয়া করছেন। এবং মুনাজাতে বলেছেন–হে আল্লাহ! আজ রোহিঙ্গারা নির্যাতিত, হে রহমান দয়াময় আল্লাহ! রোহিঙ্গা মুসলমানদের রক্ষা করুন। তারা তো আপনারই বান্দা। আপনি ছাড়া তাদের সব দরজা বন্ধ। আপনি তাদের রক্ষা করুন।

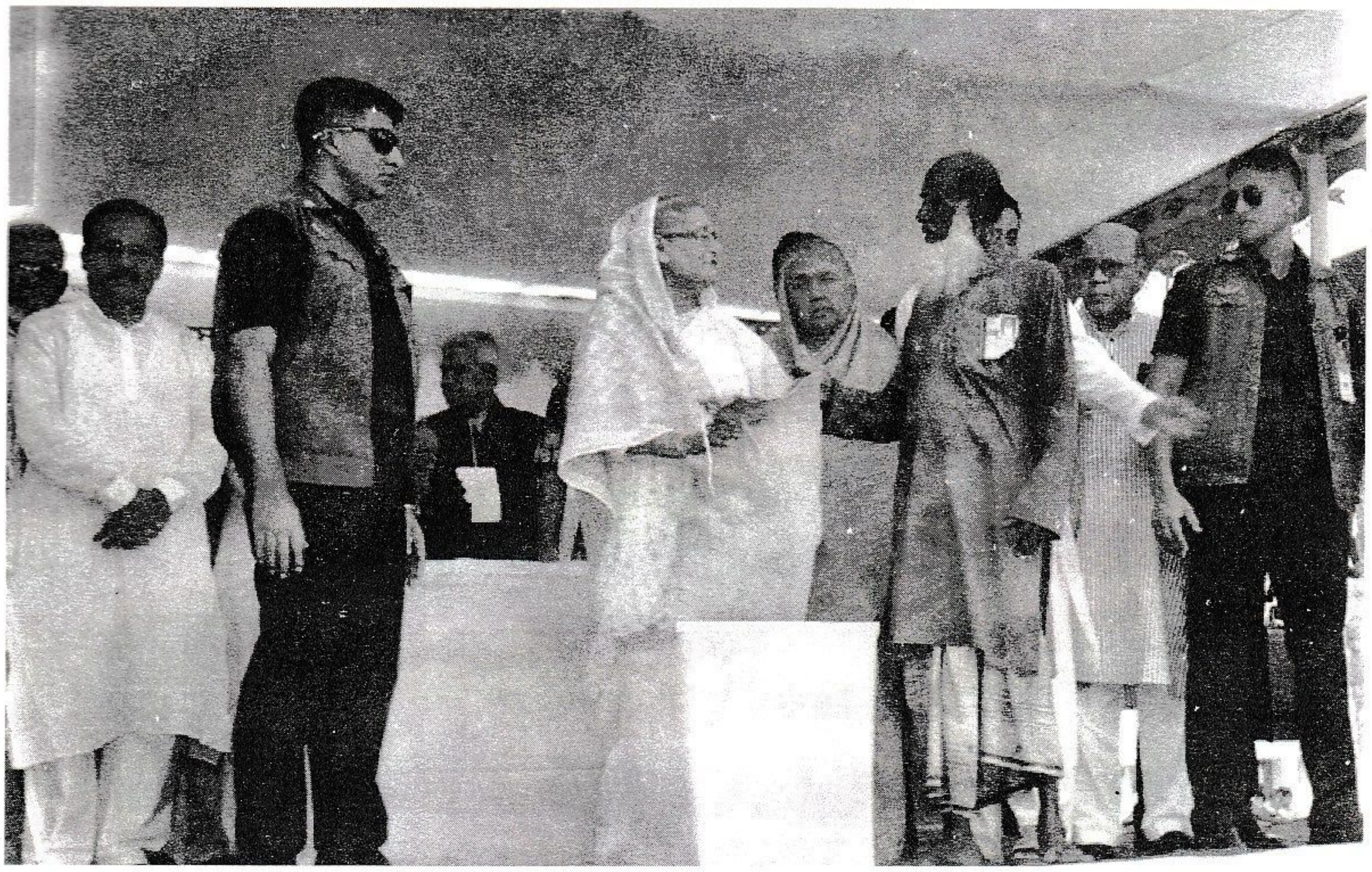

রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ধনী না হতে পারে কিন্তু আমাদের একটি বড় হৃদয় আছে। বাংলাদেশ ধনী দেশ নয়। কিন্তু যদি আমরা ১৭ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি, তা হলে আরো ১১ লক্ষ মানুষকে খাওয়াতে পারব।

রয়টার্সের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বজন হারানোর বেদনা আমি বুঝি। ঘরবাড়ি হারিয়ে যে সব রোহিঙ্গা এখানে আছেন তারা সাময়িক আশ্রয় পাবেন। আপনারা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন, সে ব্যাপারে চেষ্টা চলছে।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুবপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে শরণার্থীদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কেউ অমানবিক হলেও আমরা অমানবিক হতে পারি না। আমরা আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলোকে আবার বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না কারণ আমরা মানবিক।

কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুবপালং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়ে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার হৃদয় আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত। কেননা আমার চোখে বার বার ভেসে উঠছে ক্ষুধার্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি। আমি মাত্র কয়েকদিন আগেই আমার দেশে আশ্রয় নেওয়া কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গার

সঙ্গে দেখা করে এসেছি। যারা জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে নিজ দেশ থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত। অথচ তারা হাজার বছরেরও অধিক সময় যাবৎ মিয়ানমারে বসবাস করে আসছেন। এদের দুঃখ-দুর্দশা আমি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর আমি আমার ছোট বোনকে নিয়ে ছয় বছর বিলেতে জীবন কাটিয়েছি।

জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষ অসহায় হয়ে পড়লে তাদের আশ্রয় না দিয়ে উপায় থাকে না। এটা বাস্তবতা। হাঙ্গেরী সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য।

এই সুন্দর পৃথিবীর জনগণ এখন গভীর উদ্বিগ্ন এবং হুমকির মুখে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠি এখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য রাস্তায় যুদ্ধ করছে, দারিদ্র এবং বৈষম্য বাড়ছে। জনগণের ইচ্ছা ও স্বাধীনতা আর সম্মানিত নয়। কিছু মানুষের অশুভ ইচ্ছা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। এই বিশ্বপরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমরা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সকলের প্রতি গৃহযুদ্ধ অবসান, দারিদ্র ও বৈষম্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের স্বপ্ন হলো একটি গণতান্ত্রিক, মুক্ত এবং সাম্যের সমাজ। আমরা চাই একটি জনগণের স্বর্গ, যেখানে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা হবে এবং মর্যাদা পাবে। আমরা এমন একটি বিশ্বসমাজ চাই, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণ থাকবে চালকের আসনে।

তিনি মনে করেন একমাত্র জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। তিনি মনে করেন যে, পৃথিবীর কিছু লোক তাদের একগুয়েমী মনোভাব অন্যের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এবং কিছু লোক শাসনের দণ্ডমান নির্ধারণ করছে। তিনি আরও বলেছেন, আমরা শান্তিকামী জনগণ এই মতে ঐক্যবদ্ধ যে, কিছু লোকের আধিপত্য এবং ষড়যন্ত্রের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা এবং কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের ইচ্ছা প্রথম এবং প্রধান নির্ধারক হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, সব পরিকল্পনা কর্মসূচি ও নীতির কেন্দ্রে থাকবে জনগণ। আমরা সবাই এই যুক্তিতে অটল যে, জনগণের অংশগ্রহণ এবং

সচেতনা হলো বিশ্বশান্তি এবং উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। দেশবাসী সকলে এ ব্যাপারে অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই সব জনগণের ক্ষমতায়ন শান্তির রূপরেখায় বিদ্যমান। আমাদের শান্তিপূর্ণ পৃথিবী যাতে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদা থাকবে সেই স্বপ্ন তা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম পথ। শেখ হাসিনা হলো জনগণের ক্ষমতায়নে সত্যিকারের বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এখন বিশ্বে তিনিই সবচেয়ে ভালো জনগণের অনুভূতি পড়তে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিনি তার প্রধান রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে নিয়েছেন। আমরা দেখি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল পদ্ধতির চেয়ে শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক মডেলে জনগণের অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে একমত যে, এখন মধ্যপ্রাচ্যেসহ অন্যান্য বিশ্বসংকট মোকাবিলায় নেতৃবন্দ এবং বিশ্বসংগঠনের উচিত শেখ হাসিনার সহযোগিতা ও মতামত গ্রহণ।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে সমগ্র বাংলাদেশ শেখ হাসিনার পাশে, অভিন্ন অবস্থানে। এ নিয়ে আমাদের রাজনীতির বা কাদা ছোড়াছুড়ির কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশ যুদ্ধ চায় না, শান্তি ও কূটনীতির লড়াইয়ে শেখ হাসিনা মিয়ানমার শাসকদের পরাস্ত করতে চান। মিয়ানমার মানুষ হত্যার বিনিময়ে কলকারখানা গড়ে তুলতে আরাকানের মানুষশূন্য মাটি চায়। শেখ হাসিনা চায় মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের তাদের জন্মভিটায় ফিরিয়ে নিক। এখানে আমরা মাথানত করতে দাঁড়াইনি একাত্তরের পরাজিত সেনা শাসন কবলিত জঙ্গিবাদ,

সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই এসআই রোহিঙ্গাদের নিয়ে খেলছে। কে কোথায় খেলছে, সেটি দেখার দরকার নেই। মানবতার লড়াইয়ে নিষ্ঠুর ঘাতক আর ষড়যন্ত্রের কালো হাত জেগে উঠলে সেটি গুড়িয়ে দেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মানবতার জননী শেখ হাসিনা।

বিশ্ববিবেকের কাছে শেখ হাসিনার আকুল আবেদন রোহিঙ্গা আশ্রিতের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। মানবতাকে জাগ্রত করুন। রোহিঙ্গাদের বাসভূমি তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করুন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইড লাইনের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে এই কথাগুলো বলে ছিলেন মানবতার জননী শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের সংস্কার বিষয়ে এক বৈঠকে শেষে ডোনাল্ড ট্রাম্প বেরিয়ে যাওয়ার সময় শেখ হাসিনা তাকে থামিয়েছিলেন কয়েক মিনিটের জন্য। তখনই কথা হয় তাদের মধ্যে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে বাংলাদেশ কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করে না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন বাংলাদেশের কি খবর? জবাবে শেখ হাসিনা বললেন খুব ভালো চলছে; কিন্তু একটি সমস্যা সেটা হচ্ছে মিয়ানমার থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসেছে।

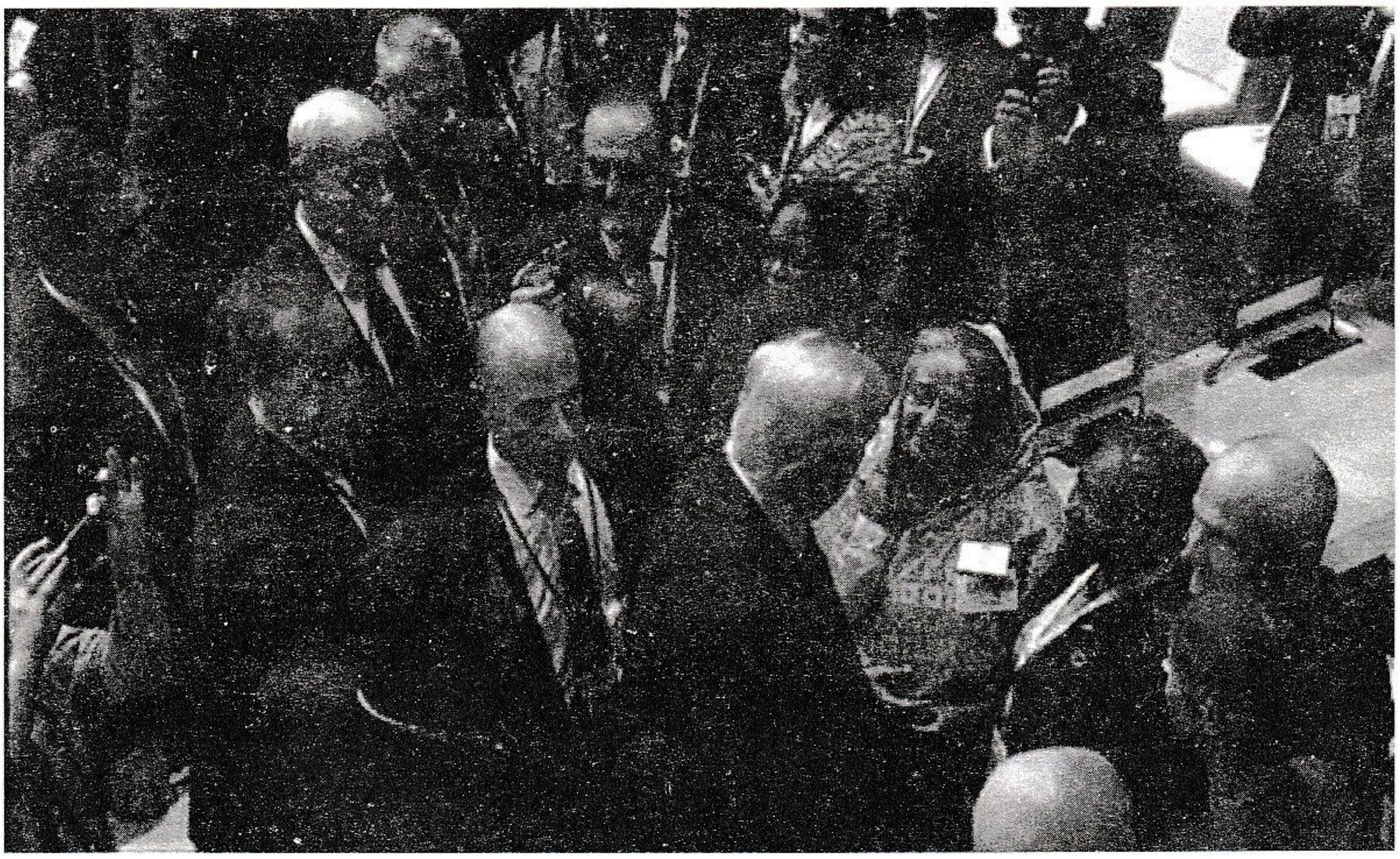

এই কথা শুনে ট্রাম্প কোনো মন্তব্যই করলেন না। প্রধানমন্ত্রী বললেন, শরণার্থী ইস্যুতে ট্রাম্পের অবস্থান পরিষ্কার। রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের বিষয়ে তার কাছে সহায়তা চাওয়া অর্থহীন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা যদি

১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি তাহলে আরও ১১ লক্ষ মানুষকে খাওয়াতে পারব। তবে এসব শরণার্থীকে যাতে ফেরত নিতে বাধ্য হয় এই জন্য মিয়ানমারের ওপর আরও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপ প্রত্যাশা করেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চির উচিত এটা মেনে নেওয়া কারণ এসব শরণার্থী তার দেশের মানুষ এবং তাদের দেশ মিয়ানমার।

মানবতার জননী প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা গ্রামবাংলার ধুলো-মাটি আর সাধারণ মানুষের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছেন। তাহার শিক্ষাজীবন শুরু হয় টুঙ্গিপাড়ার এক পাঠশালায়। ১৯৫৬ সালে তিনি ভর্তি হন রাজধানীর টিকাটুলির নারী শিক্ষা মন্দির বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৬৫ সালে শেখ হাসিনা আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন ঢাকার বকশী বাজারের পূর্বতন ইন্টারমিডিয়েট গর্ভমেন্ট কলেজ (বর্তমানে বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়) থেকে। সেই বছরই তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় কিশোরী বয়স থেকেই তার রাজনীতিতে পদচারণা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে তিনি আইউববিরোধী আন্দোলন এবং ছয় দফা আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বন্দি পিতা বঙ্গবন্ধুর আগ্রহে পরমাণুবিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার বিয়ে হয় ১৯৬৮ সালে। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সামরিক শাসকের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ১৯৮১ সালের ১৭ মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। এর পর ১৬ বছর ধরে সামরিক জান্তা ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে চলে তার একটানা সংগ্রাম। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বর্তমানে শেখ হাসিনার এক কন্যা ও এক পুত্র এবং বিশ্ব মানবতার জননী।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছেন এটি একটি দুর্যোগ। সর্বত্রই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মানবিক ভূমিকা প্রশংসিত হচ্ছে। জবাবে শেখ হাসিনা বলেছেন,

একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মানবিক গুণ রয়েছে। তিনি বলেন, অস্থায়ী ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে বাংলাদেশে ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বসবাস করছে। যদিও মিয়ানমারকে তাদের এসব নাগরিক ফেরত নিয়ে যেতে হবে। এই জন্য বাংলাদেশ মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

রাখাইনে যা ঘটছে তা সভ্য দুনিয়ায় অকল্পনীয় ঘটনা। কোনো দেশ বা জাতি কিংবা কোনো সরকার এতটা নির্দয়বর্বর এবং পাশবিক হতে পারে না। উখিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যে অবস্থা তা বর্ণনা করতে কষ্ট হয়। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের মধ্যে এমন কোনো পরিবার নেই, যে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য নির্যাতন কিংবা হত্যার শিকার হয়নি। কোনো কোনো পরিবারের সব সদস্যকেই হত্যা করা হয়েছে। নারীরা গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর নির্যাতন করে মেরেও ফেলা হয়েছে। মানুষ মেরে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্য কি বিশ্বমানবের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব? আর এই কাজটি যারা করছে তাদের কোনো হিংস্র পশুর সাথে তুলনা করা যায়।

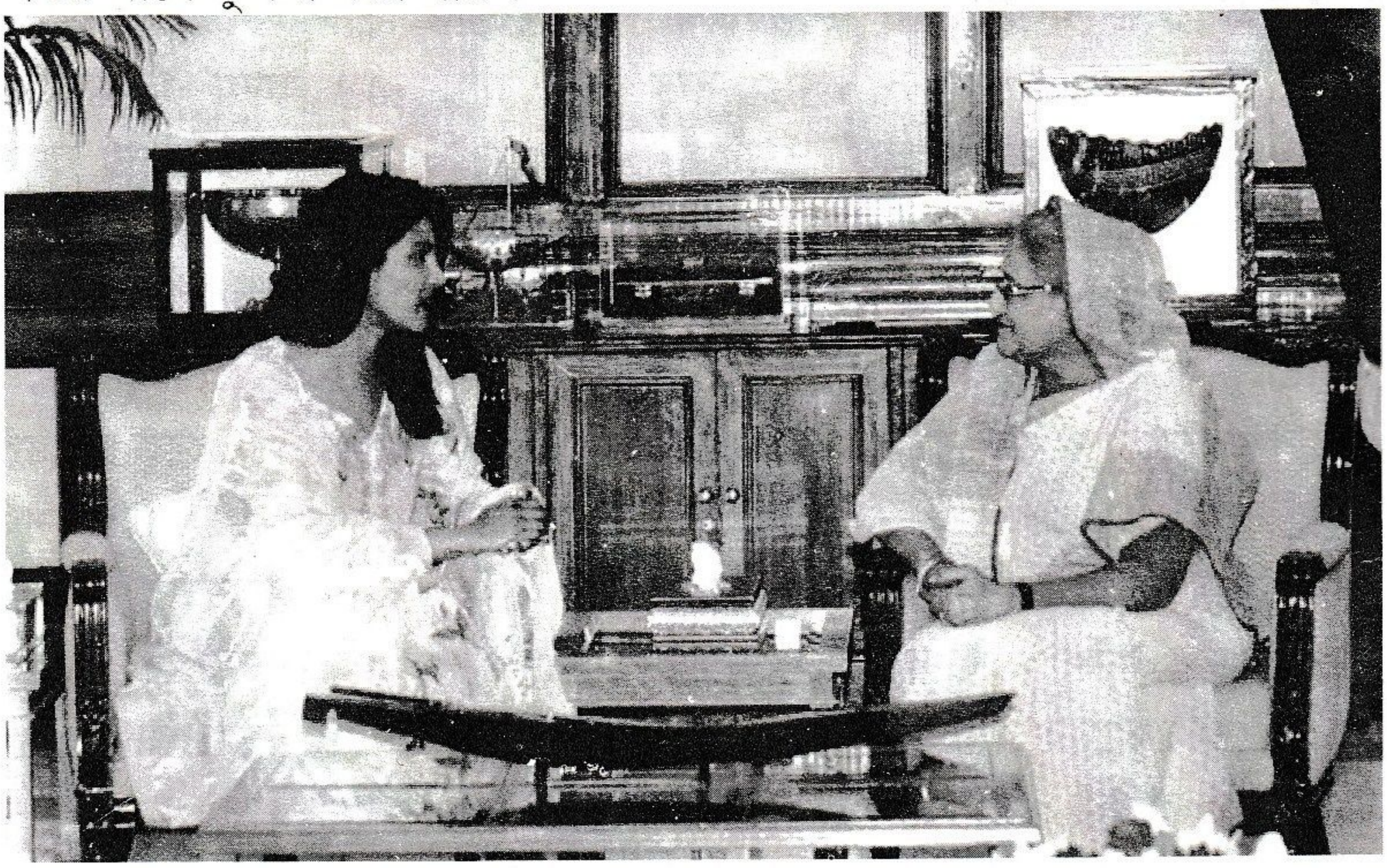

বাংলাদেশের চেয়ে বৃহৎ আয়তন এবং অনেক কম জনসংখ্যার দেশ মিয়ানমার। সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ১৩ লক্ষ। রোহিঙ্গাদের মধ্যে কিছু হিন্দু আবার কিছু বৌদ্ধও আছে। দেখা গেছে মুসলিম রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কিছু হিন্দুও রাখাইন থেকে বিতাড়িত হয়নি। ফলে এটাই প্রমাণিত হয়ে ধর্মীয় কারণেই রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাদের দেশছাড়া করা হয়েছে।

১৩ লক্ষ মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা রাখাইন থেকে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাকি তিন লক্ষ্য রোহিঙ্গা মুসলিমকে হয়ত মিয়ানমার সামরিক জান্তার হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

জাতি হিসেবে বাঙালিরা মানবিক দিক থেকে অনেক সংবেদনশীল। তাই জংলি মিয়ানমারদের অত্যাচারে একটি জাতি গোষ্ঠি রোহিঙ্গাদের এমন দুর্দিনে বাঙালিরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না। কারণ আমাদের বাঙালি জাতির রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মানবতার জননী শেখ হাসিনার সরকার রোহিঙ্গাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছেন। বাঙালি জাতি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিয়ানমারের বিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় তাদের সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। রোহিঙ্গা জাতিকে রক্ষা করতে মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ ছাড়া বিকল্প নেই। যদি মিয়ানমার তাদের শুভবুদ্ধি উদয় হয় তবে সেটা হবে তাদের জন্য মঙ্গল।

বর্তমানে রোহিঙ্গা সমস্যা এভাবে আর যুগের পর যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এবার তাদের ওপর দিয়ে যা ঘটে গেছে এবং এখনো ঘটছে তা বিশ্বইতিহাসের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। মিয়ানমারের এমন আচরণ আর সহ্য করা যায় না। তারা মনুষ্যত্বকে মানবিকতা পদদলিত করেছে। রোহিঙ্গা মুসলমান বিধায় তাদের ওপর যখন এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে তাই তার প্রতিকার হিসেবে মুসলিম বিশ্বকেও সোচ্চার হতে হবে। সেই সঙ্গে বিশ্বসমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে অবিলম্বে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সরকার কোনো ধরনের টালবাহানা করলে গোটা বিশ্ব থেকে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপসহ কূটনৈতিক সম্পর্কেচ্ছেদ করার উদ্যোগ নিতে হবে। কফি আনানের রিপোর্ট বাস্তবায়নের পাশাপাশি রাখাইনে জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে পুনর্বাসন এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য শান্তি রক্ষিবাহিনী মোতায়েনের কোনো বিকল্প নেই। জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজন মতো সৈন্য নিতে পারবে। আমাদের গর্বিত বাহিনী শান্তি মিশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। রাখাইন রাজ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে হবে এটা শেখ হাসিনা কামনা করে বিশ্বমানবাধিকার সংস্থার কাছে।

জাহিদুল কবির চৌধুরী

১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ সালে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার হেতমখাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আফাজ উদ্দীন চৌধুরী ও মাতা মরহুমা নুরুন্নাহার চৌধুরী। তিনি ১৯৮৪ সালে রাজশাহী লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৮৬ সালে রাজশাহী শাহ মখদুম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৯০ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে বি.এ এবং ২০০০ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৯৫ সালে অফিসার পদে ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেন।

জাহিদুল কবির চৌধুরী ২০০০ সালে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন এবং জীবনী, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তার লেখায় মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষকে সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখায়। মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতি অতি নিপুণভাবে তার লেখায় ফুটে ওঠে। একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ নির্মাণের লক্ষে মানুষকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি লিখে চলেছেন। সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে এবং অপরের কল্যাণে কিভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হয় সেসব দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায় তার লেখায়। তিনি ২০১৪ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ করেন। বর্তমানে তিনি মাইডাস ফাইনান্সিং লিঃ-এ কর্মরত।

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি ছবি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস (মাঝে)। পাশে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম।